বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

শ্যামসুন্দর সিংহল

সিন্দূর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ ?
চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বুল-বন কেশ !
উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায়—মন্থর নিশ্বাস !
উজ্জ্বল যার অম্বর, আর উচ্ছল যার হাস !

প্রাবৃটের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। কালো মেঘের ছায়ায় সমুদ্রের জলও কালো। ঝড়ের মত্ততায় সমুদ্র হয়ে উঠেছে উত্তাল, অশান্ত। শুভ্র ফেনশীর্ষ ঢেউগুলি প্রবল গর্জনে প্রচণ্ড আক্রোশে অবিরাম আঘাত হানছে বেলাভূমির উপর। দূরে ঘনশ্যাম বনরেখা প্রলম্বিত উপছায়ার মতো কালো দিগন্তের কোল ঘেষে বিস্তৃত রয়েছে। প্রকৃতির আজ অশ্রুসজল বিষণ্ণ মূর্তি—বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ আজ তুমুল গর্জনশীল। এমনি একটা আলোহীন আনন্দহীন শ্রাবণ দিনের ধূমধূসর অপরাহ্ণে পেনিনস্থুলার এ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টেলের বিরাট শ্বেতকায় বাষ্পপোত "হিমালয়" ধীরে ধীরে কলম্বো বন্দরে প্রবেশ করল।

প্রাথমিক অভ্যর্থনায় মন দমে যাওয়ার কথা। কোথা সেই বহুশ্রুত রৌদ্রোজ্জ্বল বেলাভূমি,আর কোথা সেই মলয়ানিল সঞ্চালিত নারিকেলবীথি ! প্রবল বাতাস আর উত্তাল ঢেউয়ে স্ফীতোদর আরব ঢাওগুলি (Dhow) জলের উপর ক্রমাগত আছাড় খেয়ে মরছে। বহু কষ্টে ছোট্ট ছোট্ট স্টিমলঞ্চ জাহাজের গ্যাঙ্গ-ওয়ের ধারে এসে

লাগল, আর রেলিং বসানো গ্যাঙ্গ-ওয়ে অবলম্বন করে অতিসন্তর্পণে লঞ্চে এসে উঠলাম।

তারপর তীরভূমি। কলম্বোর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি বহুদিন থেকেই শুনে এসেছি। কিন্তু আজ প্রকৃতি বিরূপ! এখন শ্রাবণের ঘনঘটা গগনে গগনে! বর্ষাতি নিয়ে ছাতা নিয়ে—আর যার যা সম্বল তাই নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে এল যাত্রিদল জাহাজটার অতিকায় উদর থেকে। মাঝি-মাল্লা-লস্কর-যাত্রী-আরোহী সব নিয়ে জাহাজটার জনসংখ্যা নাকি দেড়হাজার! একটা ছোট-খাট দুনিয়া যেন ভেসে যেতে থাকে অকূল দরিয়ায়। একটা অদ্ভুত সমাজ-জীবন গড়ে উঠে জাহাজ-যাত্রীদের মধ্যে। যে কতদিন জাহাজে থাকে—নিজ নিজ দেশ, সমাজ, গণ্ডী ও পরিবেশ হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে—ততদিনে একটা সাময়িক সমাজ গড়ে তোলে মানুষ তার সহজাত বৃত্তির প্রেরণায়। জাহাজের পরিবেশটিও সামাজিকতার পক্ষে অনুকূল। দুস্তর নীল বারিধি আর নিঃসীম নীলাকাশ—এই দ্বৈত বিরাট সমন্বয়ের এত সান্নিধ্যে মানুষের মন হয়ে উঠে উদার ও প্রসারিত। আধুনিক যাত্রীবাহী জাহাজগুলি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরঞ্জনের কত বিচিত্র ব্যবস্থাই না করে থাকে! খেলাধূলা, সন্তরণ, গান-বাজনা, অভিনয়, চলচ্চিত্র, লাইব্রেরী, ক্লাব—যার যা রুচি সময় কাটাবার হরেকরকম ব্যবস্থা! চিত্ত-বিনোদক অনুষ্ঠানগুলির কোন না কোনটাতে যোগদান করা প্রায় বাধ্যতামূলক বললেও চলে। আমোদ-প্রবণতা সংক্রামক নেশার মতো মানুষকে পেয়ে বসে। সবাই কিছু না কিছু নিয়ে মেতে আছে। তা আমি-ই বা বাদ যাই কেন? জাহাজে কিছুদিন থাকলেই উদাসীন নির্লিপ্তির অবসান ঘটে।

জাহাজেই এঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়···শ্রীধর্মবর্ধন, শ্রীবিজয়, শ্রীমতী বিক্রমাসিঙ্গে, ও শ্রীমতী সুদেষ্ণা কুঁ্যরে। ভারতীয় তথা বাংলা নামের সঙ্গে বেশ মিল! এঁদের আনুকূল্যেই সিংহলের অংশ বিশেষ দেখবার সুযোগ মিলল। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক কথাটা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। এঁদের নিতে এসেছেন জনকয়েক বন্ধুবান্ধবী। বেশ কিছুদিন বিদেশে কাটিয়ে এঁরা আজ দেশে ফিরছেন। তাই এঁদের এবং এঁদের যারা আগুবাড়িয়ে নিতে এসেছেন সবার মুখে-চোখেই আনন্দের আভাষ। দীর্ঘদিনের অবকাশে প্রিয়জন মিলনের আনন্দ! একটা জিনিস নজরে পড়ল—শিক্ষিত সিংহলীরা বিশেষতঃ যারা ইংরাজীনবীশ তারা প্রায় সকলেই পুরাদস্তুর সাহেবে রূপান্তরিত। নকল সাহেব ভারতবর্ষে প্রচুরসংখ্যক আজও আছে। কিন্তু বহু ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয়—আর তারাই সংখ্যা-গরিষ্ঠ আছে,—আদৌ সাহেব হয়নি এবং হওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। সিংহলীরা এ বিষয়ে আমাদের বিলিতি নকল-নবিশদের বহুগুণে হারিয়ে দিয়েছে। বিলাতের অন্ধ অনুকরণে ভারতে সব চাইতে অগ্রণী হচ্ছে বোম্বাইওয়ালারা। চলনে বলনে বেশভূষায় বোম্বাইওয়ালারা হচ্ছে উৎকট সাহেব-মেম। তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হচ্ছে বোম্বাইয়া ফিল্ম—যা আজকের দিনে সারা ভারতের বাজার ছেয়ে ফেলেছে, আর মুঠি মুঠি টাকা লুটছে। এই বোম্বাইয়া ফিল্মে আর সবই আছে—নাই কেবল কোন কলা-শিল্পের লেশমাত্র। শিক্ষিত সিংহলীরাও বিলিতিয়ানায় উদগ্র। পোষাক-আশাক, পান-ভোজন, আদব-কায়দায় নিখুঁত সাহেবিয়ানার কী ব্যগ্র প্রয়াস! কলম্বোর বাজারে কয়েকটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স আছে। সেখানে দেখা যাবে সিংহলিনীদের

অসম্ভব ভীড়। চাহিদা বেশীরভাগই হচ্ছে টিনের কৌটায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের আমদানী বীফ, পোর্ক, সসেজচীজ্, বাটার এবং ঐ শ্রেণীর আরও নানারকমের জিনিসের। গাঁয়ের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দেশীয় সারঙ্গা পরে, কিন্তু শহুরে শিক্ষিত পুরুষেরা পরে কোট-প্যাণ্ট, আর মেয়েরা অনেকে পরে মেম-সাহেবী স্কার্ট ও গাউন। তবে বোম্বাইয়ে এ জিনিসটার ছড়াছড়ি আরও বেশী। বোম্বাইয়ের রূপসীরা স্কার্ট পরে নিজেদের মনোরমা করে তুলতে চায়। বোম্বাইয়ের ক্রফোর্ড মার্কেট বিখ্যাত কেনাবেচার বাজার—সেখানে দেখেছি খাঁটি মেমসাহেবরা শাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর এদেশের নকলমেমেরা খুঁজছেন গাউন।

শ্রীমতী সুদেষ্ণা কুঁ্যরে সিংহল পার্লামেণ্টের সদস্যা এবং সম্ভ্রান্ত ও সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্ন মহিলা। তিনি আহ্বান জানালেন তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য। জাহাজঘাটায় তাঁর সুদৃশ্য গাড়িখানা প্রস্তুত। বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। শ্রীমতী কুঁ্যরেকে বিদুষীও বলা চলে। পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছেন—পড়াশুনাও মোটামুটি মন্দ নয়। কথাবার্তায় আন্ত-রিকতার ছোঁয়াচ পাওয়া যায়। বাড়ি নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী কুঁ্যরের স্বামী একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। ঘর-দোর সবই ইউরোপীয় প্রথায় সজ্জিত। খাওয়া-দাওয়া, চালচলন সবই নিখুঁত ইউরোপীয় কায়দাসম্মত। পারিবারিক কথাবার্তাও বেশির ভাগ ইংরাজীতেই চলে। কলম্বোর আরও কয়েকটি এ শ্রেণীর পরিবারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন—সবাই এ-বিষয়ে সমধর্মী। বুঝলাম যে সিংহলের ইংরাজী শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী ইউরোপীয় আদব-কায়দা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গেই রপ্ত করে নিয়েছে। সে-সময়টা

সিংহলে মিঃ সেনানায়কের শাসনকাল। কলম্বোতে প্রধান মন্ত্রীর সদর দপ্তর। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা খুব একটা দুঃসাধ্য কাজ নয়। সৌজন্য-সাক্ষাৎ প্রাথারা সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট দিনে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিকট নিজ পরিচয় ও প্রয়োজনাদি দাখিল করলে স্বল্পসময়ের জন্য সাক্ষাৎলাভ হতে পারে। মিঃ সেনানায়কের অমায়িকতা সর্বজনখ্যাত। শ্রীমতী ক্যুঁরে প্রস্তাব করলেন ঃ চলুন, প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করবেন। প্রস্তাবটি লোভনীয়। এমন একটা সাক্ষাৎকার ফলাও করে আত্ম-মহিমা প্রচারের পক্ষে খুবই অনুকূল। কিন্তু লোভ সংবরণ করলাম। সবিনয়ে শ্রীমতী ক্যুঁরেকে বললাম ঃ প্রধান মন্ত্রীকে আমি কি বলব, কয়েকটি মামুলী কথা ছাড়া আমার কি বলবার আছে—মিছিমিছি তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করি কেন? শ্রীমতী ক্যুঁরে আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনুমোদন করলেন। প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাবেব ঐ-খানেই ইতি হল।

সিংহল দ্বীপটি ছোট হলে হবে কি? প্রশাসনিক ব্যাপারে ঠাঁটের অভাব নেই। সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিব ব্যয়াধিক্য অসম্ভব রকমের। সরকারী কর্মচারীর বেতন ভারতের তুলনায় অনেক বেশী। শিক্ষা বিভাগের খুব জুনিয়ার অফিসারও নিজে মোটর গাড়ি রাখেন। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে পশ্চিমবঙ্গের কোন এডুকেশন অফিসারের পক্ষে গাড়ি রাখা যে স্বপ্নেরও অতীত, সে-কথা হলপ করেই বলতে পারি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাঙ্ক, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ খুব মোটা মোটা বেতন পেয়ে থাকেন। ফলে এ-শ্রেণীর সিংহলীদের জীবনযাত্রার মান বেশ উঁচু, কিন্তু নেহাৎ কৃত্রিম। উচ্চ বেতনের

আকর্ষণে জনকয়েক বাঙালী ভদ্রলোকও কলম্বোর কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বহুদিন উচ্চপদে সমাসীন আছেন। বিদেশে যারাই যখন যায়—সবারই খানিকটা ভোল বদল হয়। সবাই তো আর মহাত্মা গান্ধী নন, যে বিলাতের প্রচণ্ড শীতেও সেই হাঁটু-অবধি ধুতি পরে মোজাহীন পায়ে এবং গায়ে কেবল একখানা পশমী চাদর জড়িয়ে চলাফেরা করবেন। কথাটা তা নয়। দেশ, কাল ও জলবায়ু অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করাই সমীচীন। কথা হচ্ছে যে, প্রবাসী বহু ব্যক্তিই পোষাক-আশাক ও চলনে বলনে এমন একটা ভাব দেখাতে চায় যে তারা যেন কতই হোমরা-চোমরা। সিংহলীদের অনেকের মধ্যে এই ভাবটা বড্ড বেশী প্রকট। সাহেবীয়ানা জাহির করার একটা নির্লজ্জ প্রয়াস।

সিংহল দেশটা জগতের একটা ক্ষুদ্রতম দেশ, কিন্তু বাইরের ঠাট দেখে তা বোঝবার জো নেই। জনসংখ্যা ৭০ লক্ষ, আয়তন ২৫,৭০০ বর্গ মাইল মাত্র। নানান দেশে সিংহলী রাষ্ট্রদূতাবাস জাঁকজমকে অন্য দশটা দেশের সঙ্গে সমান তালে টেক্কা দিয়ে চলেছে। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আমদানীরও অন্ত নেই। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে এমন শতাধিক বিশেষজ্ঞ মোটা মোটা পারিশ্রমিকে নানা বিষয়ে সিংহলীদের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দান করছেন, আর দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত ও সার্থক করায় সাহায্য করছেন। এই সব বিদেশী বিশেষজ্ঞেরা মহা-আরামে দেশময় বিচরণ করছেন। এমনটা যে আমাদের দেশেও না ঘটছে তা নয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার কৃপায় বহু বিশেষজ্ঞ—বেশীর ভাগই আমেরিকান—আমাদিগকে বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বেতনের বহর দেখলে চক্ষু কপালে উঠতে চায়। এমনি একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞের

কথা জানি। তিনি কাগজ কেটে ও জোড়াতাড়া লাগিয়ে ফ্ল্যাশকার্ড ও ফ্লানেলোগ্রাফ ইত্যাদি তৈরী করতে সিদ্ধহস্ত expert in audio-visual education। সপরিবারে এদেশে থাকলেন বছর পাঁচেক—বেতনাদি নিতেন মাসিক হাজার চার-পাঁচ। টাকাটা যে তহবিল থেকেই আসুক না কেন—যে দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৮১৲ সে দেশে যে কোন ব্যক্তিরই একক আয় মাসিক ৪।৫ হাজার রীতিমত অন্যায়।

কলকাতার চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের ঝক্‌মকে জৌলুস দেখে যেমন বাংলা দেশের এঁদো পাড়াগাঁ সম্বন্ধে কোন ধারণাই হতে পারে না, কলম্বো শহর দেখেও তেমনি প্রকৃত সিংহলের কোন পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। কলম্বো ঝকঝকে শহর—সোজা, প্রশস্ত পিচ-ঢালা রাস্তা—বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর, সযত্ন রক্ষিত পাবলিক পার্ক ইউরোপীয় কায়দায় পরিচালিত হোটেল—এ-সব কলম্বোর বৈশিষ্ট্য। আর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—সুদীর্ঘ সমুদ্র-তীর। সমুদ্রের তীর ধরে চলে গেছে বহুদিকে সুন্দর সুদীর্ঘ রাজপথ, তার প্রায় সমান্তরাল রেলপথ। সিগিরিয়া, অনুরাধাপুর, ক্যাণ্ডি, পোলুন্নারুভা ইত্যাদি সিংহলের দর্শনীয় স্থানগুলি সবই কলম্বোর সহিত ভাল ভাল রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত।

কলম্বো হারবার কৃত্রিম, মানুষের হাতের গড়া। দৃশ্যপট মনোরম। সমুদ্র-তীর অতিক্রম করেই দেখা যাবে সুদৃশ্য হর্মাবলী। সুপ্রশস্ত মসৃণ পিচঢালা রাস্তা নানা দিকে প্রসারিত। এ অঞ্চলটি কলম্বোর সৌখীন অভিজাত অঞ্চল—'ফোর্ট' নামে খ্যাত। এ অঞ্চলে বিদেশী ও ইংরাজী-শিক্ষিত সিংহলীদের বাস। গৃহ-অলিন্দে আরাম কেদারায় আসীন কর্মহীন বিস্তর মেয়ে পুরুষকে দেখা

যাবে। কোথাও বা গৃহ-উদ্যানে ছোটখাট মজসিল বসেছে। শিক্ষিত শহুরে সিংহলীরা স্বভাবতঃ কর্মবিমুখ। শারীরিক শ্রমকে বড্ড হেয় জ্ঞান করে। শিক্ষকতা, ওকালতি, ডাক্তারি, হাকিমি বা নিদানপক্ষে একটা কেরাণীগিরি ছাড়া অন্য কোন পেশা শিক্ষিত সিংহলীর মনঃপুত নয়। বাবুগিরির দিকে বেজায় ঝোঁক। বাঙালীবাবুর সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল। কলম্বোর জনসংখ্যার একটা বিশেষ অংশ শ্বেতাঙ্গ—এঁরাই কিছুদিন পূর্বে ছিলেন দেশের শাসক ও সর্বেসর্বা।

আজ শাসনাধিকার এঁদের হাতে নাই বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে এরাই অগ্রগণ্য। সিংহলের ইংরাজ আমলের প্রভাব ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রভাব অপেক্ষা ঢের বেশি গভীর ও প্রকট। এই শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ই বিদগ্ধ সিংহলী সমাজের নেতা-নিয়ন্ত্রক। শ্বেতাঙ্গদের আদব-কায়দা, চালচলন, ঢং, মুদ্রাদোষ শিক্ষিত সিংহলীর আদর্শ স্বরূপ। শ্বেতাঙ্গকুল অবশ্যই সিংহলকে নিজ দেশ বলে কখনো মনে করে না। উঁচু মানের জীবনযাত্রায় এরা অভ্যস্ত। ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল বাড়িতে থাকে। ব্যবসায়ে লাভ করে, লভ্যাংশ দেশে পাঠায়, আর নির্দিষ্টকালে দেশে ফিরে যায়। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয় নিজ দেশে—সিংহলে নয়, যদিও সিংহলের বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে যাবতীয় বিদ্যালয়ই হুবহু বিলাতীর অনুকরণ।

কলম্বোর জনসমষ্টির আর একটা বড় অংশ তামিল। এরা ভারতাগত। এদের পেশা বহুবিধ—মুখ্যতঃ দোকানদারি ও নানা মেহনতের কাজ। রিক্সাওয়ালা সবাই তামিল। ছোট-খাট দোকানদার তামিল। শ্রমিক মজুর সবই তামিল। কলম্বো

শহরের মেথর-মুদ্দফরাস তামিল। একবার কলম্বো মিউনিসি-প্যালিটির মেথরেরা ধর্মঘট করেছিল। রাস্তার আবর্জনা, গৃহের জঞ্জাল সবই পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল—কিন্তু সিংহলে মেথর পাওয়া গেল না—সিংহলীরা সে-কাজ করবে না।

তারপর আছে মালয়ী মুসলমান আর কাবুলীওয়ালা। এরাও ক্ষণিকের অতিথি। ছোট-খাটো কারবার, টাকার লেন-দেন, কুলি-মজুরের কাজ—এদের পেশা। এরাও বিদেশী। সিংহলের স্থায়ী বাসিন্দা নয়। খাঁটি সিংহলীরা কলম্বোতে সংখ্যায় অল্প।

সিংহলীরা আসলে পল্লীপ্রিয়। কলম্বোতে আসে চাকুরী অথবা কাজকারবারের হদিসে। এ কলকাতা নয়! কলকাতা সারা বাংলা দেশের সমস্ত রস নিঃশেষে শোষণ করে নিজ দেহটাকে অস্বাভাবিক স্ফীত করেছে। বাকী দেশটা রয়ে গিয়েছে রিক্ত ও বঞ্চিত। কলকাতা হতে বেশি দূর যাবার প্রয়োজন নেই; হাওড়া ময়দানে ছোট্ট ট্রেনে চেপে ১৪।১৫ মাইল গেলেই দেখা যায় বাংলাদেশের অকৃত্রিম পাড়াগাঁয়ের রূপ। ঝোপ-ঝাড়-ডোবা, ভাঙা-চোরা কোঠাবাড়ি, বে-মেরামত রাস্তা আর পানাপুকুর এইতো পাড়াগাঁয়ের চিত্র। পাড়াগাঁয়ে না আছে আলো, না আছে আনন্দ। সবাই আমরা শহরমুখী যে।

সিংহলের দশা ততটা মন্দ নয়। কলম্বো মোটামুটি ফিটফাট ছিমছাম শহর। পল্লী-অঞ্চল বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের মতো এতো অবহেলিত, অবজ্ঞাত নয়। সমুদ্র উপকূল দিয়ে যতদূর যেদিকে যাও নিরবচ্ছিন্ন নারিকেলবীথি। নারিকেলের মাথায় মাথায় ঝড়ো হাওয়ার অবিরাম মাতামাতি। দেশের ভিতরে প্রবেশ কর—সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট রাবার বাগিচা। নিবিড় অরণ্যানী

সিংহলের এক বিশেষ শোভা। অরণ্যানীর অধিবাসী হস্তীযূথ সিংহলের বিশেষ সম্পদ। সিংহলের গ্রামগুলির একটা স্নিগ্ধ মনোরম রূপ আছে। সিংহলীরা গ্রামগত প্রাণ। শহর তার কাছে স্বপ্নের বস্তু—আমোদের জায়গা, কিন্তু সেখানে সে ক্ষণিকের অতিথি। শহর থেকে গাঁয়ে পালিয়ে আসতে পারলেই যেন বাঁচে। সমুদ্র উপকূল ছেড়ে ভিতরে গ্রামাঞ্চলে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে এক সহজ ও স্বল্পেতুষ্ট নিরুদ্বেগ জীবন ধারা। সিংহলী কৃষক বড়ই শ্রমভীরু। যেটুকু তার ন্যূনতম প্রয়োজন সেটুকু হ'লেই সে সন্তুষ্ট। অধিক মেহনত করতে সে নিতান্ত নারাজ। দেশের বহু বিস্তৃত অঞ্চল অনাবাদী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ আবাদ করলে ফলত সোনা। দেশের উৎপন্ন খাদ্যশস্য যথেষ্ট নয়। প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ করতে হয়। কিন্তু সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। গ্রামের ঘরগুলি বেশীর ভাগই বাঁশ ও নারকেল পাতার উপাদানে রচিত। প্রায় প্রতি গৃহের সম্মুখেই বেশ খানিকটা পরিষ্কার জায়গা। কাজের অবসরে গৃহবাসী এখানে বসে অবসর বিনোদন করে। সিংহলীরা পান-সুপারি প্রিয়। পান খাওয়া প্রায় সার্বজনীন অভ্যাস। এমন কি যারা বিদেশীর অনুকরণে প্রায় সাহেব বনে গিয়েছে তারাও অনেকে গোপনে এক আধটা পান পেলে তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। বিদেশী শাসনের সঙ্গে বাংলাদেশে যেমন সিংহলেও তেমনি এসেছিল ·ম্যালেরিয়া। রুগ্ন, স্ফীতোদর মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে সিংহলীদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠন ভাল। গায়ের রং তামাটে— তামিলরা কৃষ্ণবর্ণ। গাঁয়ের পুরুষেরা সাধারণতঃ হাঁটু অবধি ধুতি

ক্যাণ্ডির কাজুবাদাম পশারিনী

গগনস্পর্শী নারিকেল

বা লুঙ্গি পরে। গায়ে একটা ফতুয়া চাপায় বা চাপায় না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই একখানা দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ডে সারা দেহ সুন্দরভাবে আবৃত রাখে। আবার অনেক সময় ঊর্ধাঙ্গে পরে চোলী বা ব্লাউস এবং কটিদেশ হতে পায়ের গোড়ালি অবধি ঝুলিয়ে দেয় মেখলা। সিংহলিনীরা সুশ্রী, সুঠাম ও লাবণ্যবতী। মেয়েদের প্রধান কাজ গৃহকর্ম—ঘরদোর নিকানো—আহার্য প্রস্তুত করা ও সন্তান পালন।

গ্রাম্য সিংহলীরা হাঁচি-টিক্‌টিকি খুব মানে। চাষাবাদ, বৃক্ষরোপন, গৃহ-নির্মাণ, নৌকা ভাসান, স্থানান্তরে গমন ইত্যাদি যে কোন কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে রীতিমতো দিন ক্ষণ দেখে শুভ সময় বেছে নেয়। শুভ সময় ছাড়া কখনো কোন শুভ কাজ শুরু করা এদের রীতি নয়। চলতে চলতে পথে শোয়া কুকুর যদি তার কথায় পথ না ছেড়ে দেয় তবে তক্ষুণি বাড়ি ফিরে আসবে। কিছুতেই সেদিন আর কোন কাজ করবে না। টিক্‌টিকির ডাক, পেঁচার ডাক ভারী অশুভ। কাজ ফাঁকি দিবার হাজার রকমের ফিকির। কুঁড়ের বাদশা সব!

কলম্বো সিংহলদ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে। দ্বীপের এই অঞ্চলটায় বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী। দ্বীপের মধ্যভাগে পাহাড় ও বন। কলম্বো হতে উত্তরে যেতে হবে সিংহলের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে হলে। উল্লেখযোগ্য : সিগিরিয়া, পোলোন্নারুভা, অনুরাধাপুর, ক্যাণ্ডি।

সিগিরিয়া ভারতের অজন্তা পর্বতগুহার মতোই এক বিস্ময়কর শিল্প সৃষ্টি। বহুদূর ব্যাপ্ত অরণ্য ভেদ করে উঠেছে কুলিশ-কঠিন পাহাড়শ্রেণী। বনভূমির মাঝে মাঝে সু-উচ্চ পাহাড়। সেই

পাহাড়গাত্র খোদাই করে বিগত দিনের নিপুণ শিল্পী সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব গুহাগৃহ, আর প্রস্তর প্রাচীরগাত্রে এঁকেছেন কালজয়ী চিত্রকলা। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চমশতকে রাজা ধাতুসেনের পুত্র কাশ্যপের কীর্তি সিগিরিয়ার পার্বত্য দুর্গ।

সিংহলের আর একটি লুপ্ত গৌরব অনুরাধাপুর। সিগিরিয়ারও উত্তরে অনুরাধাপুর। এই দুইয়ের মাঝখানে রাজা কাশ্যপ তৈরী করেছিলেন এক বিরাট কৃত্রিম জলাধার। বহুদিনের উপেক্ষা অনাদরের মধ্য দিয়েও সেই প্রাচীন দিনের বিস্মৃত গৌরবের চিহ্ন আজ বহন করে অনুরাধাপুর, পোলোন্নারুভা ও ক্যাণ্ডি প্রভৃতি শহরগুলো। সিংহল দ্বীপের লুপ্তপ্রায় পুরাণো শহরগুলো পৃথিবীর প্রাচীনতম আশ্চর্যের শ্রেণীভুক্ত। কোথাও আছে বিশালকায় অখণ্ড শিলাময় বুদ্ধমূর্তি, কোথাও স্তূপ, কোথাও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও মিনার, কোথাও ছক-কাটা রাজপথ, উদ্যান, দীঘি, হাট-বাজার সম্বলিত এক সুপরিকল্পিত শহরের ধ্বংসাবশেষ। তবে ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি সিংহলে এখনও বহুলাংশে বিনষ্ট হয়নি, ফলে সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

একদিন ক্যাণ্ডি নাচ দেখবার সুযোগ ঘটল। শ্রীমতী সুদেষ্ণা কুঁয়েরের সৌজন্যেই এটা সম্ভব হল। ঠিক এ ধরণের নাচ ভারতের কোথাও দেখিনি। এ পুরোপুরি সামরিক নাচ। কিন্তু তা বলে আমাদের রায়বেঁশের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। এ নাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বলিষ্ঠতা। নাচিয়েরা পুরুষ—স্বাস্থ্যবান পেশীবহুল—দুর্দম নৃত্যের তালে তালে সুগঠিত, সুচিক্কণ পেশীগুলি স্ফীত হয়ে

উঠে। আর মাদলবাদ্যের সমন্বয়ে হস্ত-পদের কী সাবলীল সঞ্চালন!

রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ,
> শিকড়গুলির শিকল-ছেঁড়া যেন শালের গাছ।

ক্যাণ্ডিনাচের উৎপত্তিস্থান ঐতিহাসিক ক্যাণ্ডি-অঞ্চল। ক্যাণ্ডি প্রাচীন সিংহলের রাজধানী। ভগবান বুদ্ধের পূত-দন্তের রক্ষা-স্থান। প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে ভগবান বুদ্ধ একাধিকবার সিংহলদ্বীপে শুভাগমন করেছিলেন। কিংবদন্তীর সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গতির একান্ত অভাব। অশোক-দুহিতা সংঘমিত্রা এবং পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভ্রাতা) প্রথম সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে-ছিলেন। সে বুদ্ধ-মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২০০।২৫০ বৎসরের পরবর্তী ঘটনা।

সিংহলীরা মনে করে দক্ষিণ ভারত অপেক্ষা উত্তর ভারতের সঙ্গেই তাদের সাদৃশ্য অধিকতর। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। অন্ততঃ আকারে ও প্রকারে বাঙালী ও সিংহলীর মধ্যে মিল অনেকখানি। চেহারার মিল খুবই বেশী। মেজাজের দিক দিয়েও সাদৃশ্য বেশ আছে। মহাবংশোল্লিখিত দুর্জয় বাঙালী বীর বিজয়সিংহ হতেই সিংহলীদের উৎপত্তি—এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করে। কিংবদন্তী অনুযায়ী বিজয়সিংহ এক বন্য কেশরীর ঔরসে আর এক রূপবতী রাজকন্যার গর্ভজাত সন্তান। দুরন্তপনার অভিযোগে স্বদেশ হতে নির্বাসিত হয়ে—সঙ্গীদলসহ অকূল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিংহলে উপনীত হন এবং বাহুবলে রাজ্যজয় করে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়"

এই কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে কবি-কল্পনা উৎসারিত হয়েছে। বিজয় সিংহলের আদিবাসী ভেদ্দা জাতির রাজকন্যা কুইরেণীকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহের ফলে তিনটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। বিজয় প্রথমে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হননি। ভেদ্দারা তাকে প্রতি পদেই বাধা দিতে থাকে। কিন্তু বিজয় স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকবার লোক ছিলেন না। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিমিত —সারা সিংহলের উপর আধিপত্য স্থাপনই ছিল তার লক্ষ্য। আর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করল জাতিদ্রোহিণী কুইরেণী। কুইরেণীর পরামর্শে ও সাহায্যে বিজয় ভেদ্দা রাজধানী শ্রীবস্তীপুর আক্রমণ করে প্রত্যেকটি অধিবাসীকে হত্যা করলেন। এইভাবে সমগ্র ভেদ্দা রাজ্য তাঁর করতলগত হল। কুইরেণীর কিন্তু শেষ-রক্ষা হল না। নিজের বর্ধিত শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বিজয় এইবার তিন কন্যাসহ কুইরেণীকে পরিত্যাগ করলেন। স্বামী পরিত্যক্তা, নিরুপায়া নিরাশ্রয়া কুইরেণী ফিরে গেল আবার ভেদ্দা সমাজে। কিন্তু ভেদ্দারা প্রতিশোধ নিল কুইরেণীর প্রাণহরণ করে। বিজয়ের মৃত্যু হয় অপুত্রক অবস্থায়। এই হল মোটামুটি বিজয়সিংহ সম্বন্ধে সিংহলে প্রচলিত কিংবদন্তী।

সিংহল দ্বীপের আর একটি দর্শনীয় স্থান—ডোণ্ড্রা। নারিকেল-কুঞ্জ পরিবেষ্টিত সমুদ্র উপকূলের একটি ছোট্ট গ্রাম। দ্বীপের সর্ব-দক্ষিণে এর অবস্থান—এর পর কেবল ধূ ধূ নীল জলরাশি। ডোণ্ড্রাকে বলা হয় ল্যাণ্ডস্ এণ্ড—শেষ ভূখণ্ড। এর পর একেবারে দক্ষিণমেরু মহাদেশ অবধি না গেলে আর পা ফেলবার মতো শক্ত

জায়গা মিলবে না। সমুদ্রগামী জাহাজের দিক-নিশানার জন্য এখানে আছে একটি বাতিঘর।

স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত পরিক্রমা শেষ করে আবার কলম্বো ফিরে এলাম। শ্রীমতী সুদেষ্ণাকে অশেষ ধন্যবাদ—তাঁর আনুকুল্যেই এতটা সম্ভব হল। সিংহলে তাঁর বহুল প্রভাব প্রতিপত্তি। তাঁর দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে যার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছি তার কাছেই পেয়েছি সাদর অভ্যর্থনা ও সহৃদয় ব্যবহার। এই প্রসঙ্গে আরও দু'জন ভদ্রলোকের নামোল্লেখ না করলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হব। এঁরা হচ্ছেন সিংহলের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদাসীন কর্মচারী মিঃ ধর্মবর্ধন এবং মিঃ সম্বুদ্ধ।

অল্প কয়েকটা দিনের জন্যই সিংহলে এসেছিলাম। কতটুকুই বা দেখলাম, আর কতটুকুই বা জানলাম! কিন্তু অনেক কিছুই যে দেখা হল না বা জানা হল না, তাই যেন সামান্য যা কিছু দেখলাম তাকে আরও মনোরম করে তুলল। Yarrow visitedএর চাইতে Yarrow unvisited সর্বদাই অধিকতর আকর্ষণীয়। কিন্তু সিংহলকে ভালবেসে ফেলেছি, প্রায় প্রথম দর্শনেই অনুরাগ।

এই সমুদ্রস্তনিত দ্বীপ—এর নারিকেলকুঞ্জে ঝড়ো হাওয়ার অশ্রান্ত মাতামাতি—এর শ্যাম শৈলশ্রেণী, এর স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম বনভূমি—রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশ আর সর্বোপরি শান্তস্বভাব, স্বল্পে তুষ্ট ও পল্লীগতপ্রাণ সিংহলী কৃষক পরিবার—মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। ভাষার বিভিন্নতা বাদ দিলে সিংহলীর মধ্যে অতি সহজেই বাঙালী তার স্বজনকে আবিষ্কার করে। কোন সুদূর অতীতে বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপে এক বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন—দীর্ঘ যুগের অবকাশেও উত্তর পুরুষের মধ্যে

সেই পথিকৃৎ ঔপনিবেশিকের ছাপ অম্লান রয়ে গিয়েছে। তাই প্রশ্ন করি ঃ

দেখতো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা।

এদিকে শেষের দিন যে ঘনিয়ে এল। কলম্বোর উপকণ্ঠে এক সৌখীন হোটেল। তারি এক সুসজ্জিত কক্ষের বাতায়নে বসে সফেন সাগর ঊর্মির লীলা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি। বারবার মত্ত আবেগে সাগর তরঙ্গ বেলাভূমির উপর আঘাতের পর আঘাত করে ফিরে যাচ্ছে। উন্মুক্ত আক্রোশে আবার ফিরে আসছে- আবার রজতশুভ্র উচ্ছ্বাসে কণায় কণায় ভেঙ্গে পড়ছে। সর্বংসহা বসুন্ধরা অসীম ধৈর্যে অনন্তের সবেগ আলিঙ্গন বুক পেতে নিচ্ছে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় স্থাণুবৎ, আর প্রকৃতি লীলাচঞ্চলা। তীর ও তরঙ্গের এই নিত্যলীলা যেন সেই সৃষ্টি রহস্যেরই এক অপূর্ব অভিব্যক্তি। কাক-পক্ষ মৌসুমী মেঘে গগনাঙ্গন আবৃত। নৈসর্গিক পরিমণ্ডল আসন্ন বর্ষণের আশঙ্কায় মৌন গম্ভীর।

মেঘলা থমথম সূর্য ইন্দু
ডুবল বাদলায় দুলল সিন্ধু—

আমার মনের আকাশও আজ ভারাক্রান্ত। ছেড়ে যাচ্ছি এই মনোহর মরকত শ্যাম দেশ! ছেড়ে যাচ্ছি সহৃদয় সিংহলী বন্ধুদের! আবার কোনদিন ফিরে আসা হবে কিনা? মানচিত্রে যে ছোট্ট দেশটি অনতিপ্রশস্ত লবণজলের ব্যবধানে ভারতবর্ষ হতে বিচ্ছিন্ন দেখে এসেছি এতোদিন, আজ তারি স্থান চিরতরে নির্দিষ্ট হয়ে গেল স্মৃতির মণিকোঠায়।

ভুটিয়া পথচারী

সিকিম-মহারাজ ও মহারাজকুমার সহ লেখক

সিকিমের পথে

একটা জমকালো কথা দিয়ে এ কাহিনী শুরু করতে পারলেই ভাল হ'ত। কিন্তু তা কি করবার জো আছে? যা বলব তাই তো মামুলী। সেই পুরানো শিলিগুড়ি—তার কি-ই বা আছে, যা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে বাহারী কথার মারপ্যাঁচ তৈরী করা যায়। পুরানো দিনের শিলিগুড়ি ছিল শৈলবিহারী সায়েব-সুবোদের ছোটা-হাজরির স্টেশন। 'গরমি যখন ছুটত না আর পাখার হাওয়ায় সরবতে'—তখনই কলকাতার সাহেব-মেমেরা দলে দলে দারজিলিং-মুখো হতেন। সে-সময়কার বাংলা সরকারের গ্রীষ্ম-কালীন 'হিল-এক্সোডাস' ছিল একটা রুটিন-মাফিক বার্ষিক ঘটনা। রাত আটটায় ডিনার খেয়ে সায়েব-সুবোরা শিয়ালদা স্টেশনে দারজিলিং মেলে চেপে বসতেন। ফার্স্ট ক্লাস কামরায় কালা-আদ্মির প্রবেশাধিকার প্রায় ছিল না বললেই চলে, তাই ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলো দেখাত তামাম লালে লাল। সারা স্টেশন-প্লাটফর্মটা লালমুখো আর লালমুখীর সমাগমে লালচে হয়ে উঠত। ইতরজন কালা-বাবুরা সভয়ে সসঙ্কোচে বিজলীবাতি-ঝলমল রেল-কামরা, তাদের আরোহী, আর আর্দালি-বয়-খানসামার ত্রস্ত ছোটা-ছুটি লক্ষ্য করত। একরাত ঘুমের শেষে সাহেব-মেমেরা শিলি-গুড়িতে এসে খেতেন ছোটা-হাজরি। আবার সময় সময় এই পথেই আসতেন-যেতেন মহামান্য বাংলার লাটসাহেব। পুলিশের

তৎপরতা, লাটানুচরবৃন্দের জাঁকজমক আর ইতরজনের ভীতি-মিশ্রিত কৌতূহল—এই সব মিলে শিলিগুড়ির পুরানো স্টেশনটাকে সরগরম ক'রে তুলত। সে-সব কী দিনই বা গেছে।

পুরানো শিলিগুড়ির সে-দিন আর নেই! পুরানো স্টেশনটার এখন অনাদৃত অবস্থা। সে জৌলুস আর নেই। একটা নতুন শিলিগুড়ি স্টেশন গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার পরে। এখন আর *শিয়ালদা স্টেশনে সন্ধ্যেবেলায় গাড়িতে চেপে তার পরদিন* ভোরে শিলিগুড়ি পৌঁছুবার উপায় নেই। পাকিস্‌তান-হিঁদুস্‌তানে আশমান-জমিন ফারাক। মনকষাকষির অন্ত নেই। ভাগাভাগির পর কতো দিকে কতো আঁটাআঁটি-ই না হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষের হয়রানির একশেষ! এখন শিলিগুড়ি যেতে গেলে সাতরাজ্য ঘুরে দু'বার গাড়ি বদল ক'রে প্রায় বিশ ঘণ্টা বাদে সেখানে পৌঁছুতে পারা যায়। আর গাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। আসাম-লিঙ্কের গাড়ির সময়-শৈথিল্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে। কলকাতা থেকে সক্‌রিগলিঘাট, তার পর গঙ্গা। স্টীমারে যাত্রী পারাপার করে। চড়ায় না আটকালে ওপার যেতে ঘণ্টা দুই। কিন্তু হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে। সাত-আট ঘণ্টা অবধি চরে আটকে পড়ে থাকতে হয়েছে অনেককেই। এমন একটা সুখকর 'জার্নি' করবার সুযোগ পেয়েছি আমরা স্বাধীনতা-অর্জনের দৌলতে। সাধে কি আর কবি ছড়া বেঁধেছেন :

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি।

আগেকার ন'ঘণ্টার সরাসরি পথ আজকাল নানান মুলুক ঘুরে মাত্র বিশ ঘণ্টায় শেষ করতে হয়। এ-সব এমনটি হয়েছে দেশ-বিভাগের দৌলতে! অথচ দেখুন, ওই পাকিস্তানের 'কাউয়া' আর ভারতের 'কাক' নির্বিবাদে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে উড়ে যাচ্ছে। তাদের বেলায় পাসপোর্ট আর ভিসার কোনো বালাই নাই। যত হাঙ্গাম মানুষের বেলায়।

মানে মানে শিলিগুড়ি পোঁছলাম-তো যেন বাঁচলাম। ভোর পাঁচটা। ঘুমভরা চোখে একটা আচমকা হুঁচোট খেয়ে প্লাটফর্মে নামলাম। চারিদিক অন্ধকার—কেবল প্লাটফর্মে দু'চারটা বাতি তখনো টিমটিম জ্বলছে। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম। ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে সব-কিছু ঝাপসা হয়ে গেছে অবিরল বৃষ্টিধারায়। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই জীপে চড়ে বসলাম কালিম্পং-এর পথে। সারা পথেই বৃষ্টি, আর বৃষ্টি। শিলিগুড়ি-কালিম্পং পঞ্চাশ মাইল—খালি চড়াই আর চড়াই। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা বের করা হয়েছে। অজগরের মতো পাহাড়কে বেষ্টন ক'রে রাস্তা চলেছে পাকে পাকে। একদিকে নিরেট গ্র্যানাইট-প্রাচীর অনেক অনেক উঁচু, নাগালের বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু অপর পার্শ্বেই অতল খাদ ১০০।১৫০ ফুট অবধি গভীর। নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। রাস্তা সঙ্কীর্ণ ও অসম্ভব আঁকাবাঁকা। একটা গাড়ি কোনমতে চলে। অন্য দিক থেকে গাড়ি এলে সসঙ্কোচে একপাশে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিতে হয়। প্রতি বাঁকেই বিপদের আশঙ্কা। বাঁকের ও-পাশে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। গাড়ির হর্নও বড়-একটা শুনা যায় না। মালবোঝাই ট্রাক আর লরী চলার বিরাম নাই। আর ওরা চলে অতি বেপরোয়া ভাবে। অপরের সুবিধা বা নিরাপত্তার দিকে

ট্রাক-ড্রাইভারদের বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত নেই। যেমন দেখা যায় কলকাতার রাস্তায় বা গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে, ঠিক তেমনি দেখা যায় এই বিপদসঙ্কুল পার্বত্যপথে ট্রাক-ড্রাইভারদের উচ্ছৃঙ্খল অবাধ আচরণ। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য ও আফসোসের বিষয় হচ্ছে এই যে, নিয়মভঙ্গকারী লোকগুলিকে শায়েস্তা করতে পুলিশ ও শাসক-সম্প্রদায় বহুলাংশেই অপারগ। দারজিলিং-কালিম্পং ও গ্যাংটকের সঙ্কীর্ণ ও সর্পিল পথেও এরা গাড়ি চালায় আপন মর্জিমতো, আর বেশিরভাগ দুর্ঘনাই ঘটে এদেরই অসতর্কতার দরুন। পথ দুর্গম ও বিপজ্জনক, কিন্তু আশঙ্কার একটা বড় কারণ—ভারী ভারী লরী ও ট্রাক-ড্রাইভারদের যথেচ্ছাচার। কতবার এই শ্রেণীর বেপরোয়া চালকদের হঠকারিতায় বে-কায়দায় পড়েছি! মরতে মরতে বেঁচে গেছি অনেকবার। বাঁকের অদৃশ্য আড়াল হ'তে কোন সঙ্কেতধ্বনি না করেই একটা ট্রাক হঠাৎ সবেগে সামনে এসে উপস্থিত—এ-পক্ষ হ'তে যথারীতি সঙ্কেতধ্বনি করা হয়েছে, কিন্তু তা ও-পক্ষ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রেই ছুটে চলেছে। লরী-ট্রাকের ড্রাইভারেরা রাস্তায় গাড়ী হাঁকাবার সময় বোধ হয় মনে মনে নিজেদের পথের একচ্ছত্র অধিকারী ব'লে মনে করে। পথে আর কারুর অধিকার তারা মানতে আদৌ রাজী নয়। তাই তারা ক্বচিৎ কাউকে পাশ ছেড়ে দেয়। নিজের ভারী ও ভরাট কলেবরটি সম্বন্ধে এরা খুব সচেতন। ধারে না কাটলেও, এরা ভারে কাটে।

প্রাণটি হাতে নিয়ে আমার মতো নিরীহ ব্যক্তির এ-হেন পথ-পরিক্রমায় কী দুঃসহ মানসিক অস্বস্তি! কিন্তু অন্যদিকে এই অস্বস্তিময় পরিবেশের একটা বড়রকমের সান্ত্বনাও আছে। সে সান্ত্বনা হচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে প্রকৃতির মনোহারিণী শোভা।

বৃষ্টিধারার বিরাম নেই। কখনো ঝিরঝির আবার কখনো ঝমঝম। মাঝে মাঝে গাছপালা পাহাড়-খাদ, মায় রাস্তাটা অবধি ঝাপ্সা হয়ে যায়—কিচ্ছু দেখা যায় না। মোটরের হেড-লাইটটা ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্বলতে থাকে। পাহাড়ের গা বেয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নেমে এসে চারিদিক কুজ্‌ঝটিকায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। বৃষ্টির প্রকোপ একটু কমে আসে, চারিদিকের দৃশ্য পরিস্ফুট হয়। ধারাস্নাত গাছপালার সৌন্দর্য সুন্দরতর হ'য়ে ওঠে, যখন তার উপর ঝিকমিক করে সাতরঙা আলোর আলপনা। এ পথে মানুষের আনাগোনার বিরাম নেই। কিন্তু পথের দু'ধারে অকৃপণা প্রকৃতি-লক্ষ্মীর যে অনবদ্য রূপসজ্জা, তার দিকে চোখ মেলে তাকাবার অবসর আছে কয় জনার? সবাই ছুটেছে কোনো-না-কোনো একটা মতলব নিয়ে। কেউ ছুটেছে অর্থের সন্ধানে—বেশী মুনফায় বেসাতি-বিক্রির ফিকিরে। এদের সংখ্যাই আজকাল বেশী। আর কেউ-বা চলেছেন নেহাত ফুর্তির খোঁজে। তাঁরা সখের শৈল-বিহারী। এঁরা চোখ দিয়ে দেখেন বটে সবই—ক্যামেরার ক্লিক্-ক্লিক্ আওয়াজও ওঠে অনুক্ষণ, কিন্তু এদের দৃষ্টি বহির্দৃষ্টি। বহির্দৃশ্যের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে অনুভূতি-সাপেক্ষ একটি সূক্ষ্ম প্রকৃতি-আত্মা, যার রহস্যঘন স্বরূপ সাধারণের স্থূলদৃষ্টির সীমিত বৃত্তরেখার বহির্ভূত। সেই আনন্দময় অন্তরলোকের আভাষটুকুই আমাদের কাম্য। বিশ্বপ্রকৃতির নাড়ীর সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, আর তারই ফলে যে প্রকৃতির কোলে মানুষ আদিম শিশুটির মতো একদিন এসেছিল—সেই আদি-শৈশবের আনন্দ-বিহ্বল অনুভূতিও হারিয়ে ফেলে। এ-কথাটিই কবি নানা ছন্দে, নানা-ভাবে বার বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঃ

মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে অরণ্যের পল্লব-নিলয়ে
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান-রবে শতবার ক'রে
সমস্ত ভুবন।
আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব-মাঝে যেথা হ'তে অহরহ
অঙ্কুরিছে, মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান।

এদিকে চড়াই-পথে এগিয়ে চলেছি। এখন কুয়াশা অনেকটা কেটে গিয়েছে। আমরা যে উচ্চতায় উঠে এসেছি সেখানে সব পরিষ্কার, কিন্তু নীচের পাহাড় তখনো কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা— সেখানে তখনও অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। গায়ে শীত লাগছে বেশ। জীপের সামনের একধারের আসনে বসে ছিলাম। বৃষ্টির ঝাপ্টায় পানিকোট ভিজে গায়ে লেপ্টে বসে গিয়েছে। ভিতরের জামার অবস্থাও তাই। শীতে গায়ের কাঁপুনি বাড়ছে। বস্ত্র-পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। এভাবে অধিক সময় ভিজে কাপড়ে থাকলে নিউমোনিয়া অনিবার্য।

গাড়ি থামল প্রথম তিস্তা-বাজারে। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বস্ত্র-পরিবর্তন করা গেল। পানিকোটের ভিতর কোট-শার্ট, মায় গেঞ্জী অবধি ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গিয়েছিল। সেই কোন্ সকালে শিলিগুড়িতে গাড়ি চেপেছিলাম, তিস্তা-বাজার অবধি আসতেই বেলা বেজে গেল বারোটা। কারণ, গাড়ি অনেক সময়

চলতেই পারেনি—বৃষ্টিতে পথ দেখা যাচ্ছিল না, তারপর পথ হয়েছে পিছল।

শিলিগুড়ি ছেড়ে মাইল সাতেক পরেই কালীঝোরার সংরক্ষিত বন। বনের ভিতর দিয়ে সুন্দর মসৃণ পীচ-ঢালা পথ। দুই পাশে ঘন শালবন—মাঝে মাঝে বন কেটে জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে আছে কাঠের চাং-বাংলো। এসব বাংলোতে বন-বিভাগের কর্মীরা থাকেন। আশে পাশে লোকালয় নেই। এসব বাংলোর যাঁরা অধিবাসী তাঁদের না-জানি কিভাবে দিন কাটে! মাঝে মাঝে মনে হয়—এঁদের অবস্থায় এঁরা হয়তো আদৌ সুখী নন—কিন্তু আমার যদি এ অবস্থা হ'ত!

মনে পড়ে সেই সুদূর অতীতের ছেলেবেলার কথা। বাবা কাজ করতেন আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পাহাড়-বন-বেষ্টিত একটি চা-বাগানে। আমাদের খড়ের বাংলোর অদূরেই চা-বাগান, আর খানিক দূরেই দুর্ভেদ্য নলখাগড়া ও ঘাসের বন। এ বনের আয়তন বড় কম নয়। দূরে ডাফ্‌লা পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এ জঙ্গল যেমন দুর্গম তেমনি বিপদসঙ্কুল। চিতাবাঘ, নেকড়ে, শুয়োর, বুনো মোষ, হরিণ প্রভৃতি আরণ্য জীবের অবাধ বিচরণ ভূমি। কখনো কখনো দিনের-বেলাতেই এরা এদের আরণ্য আবাস ছেড়ে চা-বাগানে হানা দিত। বাগানে কার্যরত কুলীর দলে হৈ-চৈ পড়ে যেত—'শের নিক্‌লায়া, শের নিক্‌লায়া!'

আমরা তখন নেহাত বালক। রাত্রে মা নিজের হাতে আমাদের দু'ভাইকে খাওয়াতে বসেছেন। বাবা তখনও বাসায় ফিরে আসেননি। ভাতের গ্রাস মুখে দিতেই অদূরবর্তী জঙ্গলে বাঘ

ডাকতে শুরু করেছে। হুম্ হুম্ হুম্—বাঘটা চীৎকাব করেই চলেছে। শ্রান্তি নাই বিরাম নাই। গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে মায়ের কোল ঘেঁসে বসে দূর-বনের বাঘের ডাক শুনতে ভারী ভাল লাগত। কিন্তু বাবার জন্য মনটা আশঙ্কায় ভ'রে উঠত। বাবা হয়তো পাশের কোনো বাগানে সান্ধ্য গান-বাজনার মজলিসে গিয়েছেন। বাবা ভালবাসতেন তাসখেলা দাবাখেলা আর গান-বাজনা। সারাদিনের কাজের পর সাইকেলে গ্যাস-ল্যাম্প জ্বালিয়ে চলে যেতেন ৫।৭ মাইল দূরের বাগানে। কোনদিন বা আসর বসত আমাদের বাসায়। মা আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিতেন। তারপর বসে থাকতেন বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত। আজ কালীঝোরা বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সেই কতদিন আগের স্মৃতি যেন ঘুম থেকে জেগে আমার মনের দুয়ারে ভীড় ক'রে দাঁড়াল। তাই ভাবছিলাম, ক্লেদ-কোলাহল-ক্লিষ্ট কলকাতা সহরের নাগপাশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে এই আরণ্য-প্রকৃতির কোলে একটু আশ্রয় পেলে হয়তো ভালই হ'ত।

কালীঝোরার জঙ্গল ছেড়ে সেবক-নদের পুল পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি—এবার চড়াই শুরু হ'ল। তিস্তা-বাজার অবধি একটানা চড়াই-পথ। পথে পড়ল রিহাং নদী। শীর্ণকায়া পাহাড়ী ঝরণা চঞ্চল চরণক্ষেপে চটুল নৃত্যে নিম্নগামিনী। আজ বৃষ্টি ধারায় এর ক্ষীণ কলেবর বেশ পুষ্টিলাভ করেছে। কলস্বরে জেগে উঠেছে গর্জনের আভাস। ইঞ্জিনের শব্দ ছেপে রিহাং-নদীর কলগর্জন কানে আসছে।

পাহাড়ের গাত্রদেশ বেয়ে-বেয়ে নেমে-আসা অসংখ্য জলধারা খরবেগে রাস্তার উপর দিয়ে গড়িয়ে ওপাশের খাদে গিয়ে পড়ছে।

এ পথে ত্রিস্রোতা আমাদের নিত্য সঙ্গিনী। সারা পথেই ত্রিস্রোতা দক্ষিণ-বাহিনী। একশো-দুশো ফুট গভীর খাদের তলদেশ দিয়ে ত্রিস্রোতার রূপালী জলধারা প্রবাহিত।

রিহাং পার হয়ে এলাম রম্বি নদীর কাছে। রম্বিও রিহাং-এর মতোই পাহাড়ী ঝরণা। 'ঝরণা ঝরণা, সুন্দরী ঝরণা—তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা'! রম্বি আর ত্রিস্রোতার যেখানে সঙ্গম, সেখানেই কালিম্পং-এর সড়ক হ'তে আর একটা পথ বাঁদিকের পাহাড়ে উঠে গিয়েছে—মংপুর সিনকোনা আবাদের দিকে। মংপু—যার সিনকোনা-খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি।

তিস্তা বাজারের কাছেই তিস্তা-ব্রীজ। তিস্তা-ব্রীজ পেরিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথটা আবার দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে গেল। একটা গেল কালিম্পং-এর দিকে আর অপরটা চলল সিকিমাভিমুখে। এখান থেকে সিকিম পুরো আটচল্লিশ মাইল—চড়াই আর উৎরাই, উৎরাই আর চড়াই। ত্রিস্রোতা এখনও আমাদের সহচরী, তবে এখন বামগামিনী। আরও কিছুদূর কলনাদিনী ত্রিস্রোতা আমাদের পাশে-পাশেই চলল। তারপর কখন যে পাহাড়ের কোন্ বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিকে আর নজর রাখিনি।

পর পর পথে আরো কয়েকটি নদীর সাক্ষাৎ মিলল—রংপো নদী, ঋষি নদী আর সিংতাং নদী। সিংতাং নদীর ধার ঘেঁষে গাড়ি চলেছে ধীর-মন্থর গতিতে। বেলা শেষ হয় হয়। দূর পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনও অন্ধকার হয়নি, কিন্তু গিরিপথে অপরাহ্নের পাণ্ডুর ছায়া ধীরে ধীরে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। হঠাৎ গাড়ির গতি রুদ্ধ হ'ল। সামনেই বিপুল

ধ্বস নেমেছে। দিন-কয়েক পূর্বেই এখানে একটা বিরাট ল্যাণ্ড-স্লাইড হয়ে গেছে। সেই ল্যাণ্ড-স্লাইডে একটা গোটা পাহাড়ী বস্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বহু লোক মাটি পাথর-চাপা প'ড়ে প্রাণ হারিয়েছে। এতবড়ো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এ-অঞ্চলে ঘটেনি।

পাহাড়ে খুব প্রবল বর্ষণ হ'লেই সাধারণতঃ ধ্বস নামে। দারজিলিং ও কালিম্পং-এর পথে বর্ষাকালে প্রায়ই এরূপ ঘটনা ঘটে। আর তখন কখনো ঘণ্টাকয়েক আর কখনো বা দিন-কয়েকের জন্য গাড়ি-চলাচল বন্ধ থাকে। রাস্তা-মেরামতকারীর দল এসে পাথর-মাটি সরিয়ে আর ভাঙা রাস্তা মেরামত ক'রে আবার যানবাহন-চলাচলের পথ ক'রে দেয়। এবারে সিকিমের রাস্তায় যে ধ্বস নেমেছিল তা এতই গুরুতর রকমের হয়েছিল যে, মাসখানেক তার জের চলেছিল—অর্থাৎ যানবাহন-চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল—মোটর যাবার উপায় ছিল না। খচ্চরের পিঠে মানুষ মালপত্র নিয়ে অতি সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে চলত। একটা জায়গায় প্রায় গোটা পাহাড়টাই যেন উপড়ে প'ড়েছে। মাটি, পাথর আর মূলোৎপাটিত বড় বড় গাছের স্তূপের নিচে ত্রিস্রোতার গতিপথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। নদীর এ-পার ও-পার বরাবর এক কৃত্রিম বাঁধ, বাঁধের উপরদিকে জল-জমে জমে সৃষ্টি হ'ল এক হ্রদ। আর সেই হ্রদের জল ঊর্ধ্ব হ'তে নিরন্তর প্রবহমান স্রোতের প্রবল ধাক্কায় ফেনিল আক্রোশে স্ফীত হয়ে উঠতে লাগল কৃত্রিম বাঁধকে উল্লঙ্ঘন করবার জন্য। অথচ বাঁধের নিচের দিকে নদীবক্ষ ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠল। বাঁধ ভেঙে উপরের জলরাশি যদি প্রবল বেগে ধেয়ে আসত

তাহলে ঘটত সমূহ অনর্থ, অর্থাৎ সে প্রবল-প্লাবনে সমতলভূমির ত্রিস্রোতায় যে জলস্ফীতি ঘটত তাতে জলপাইগুড়ি জেলা বন্যায় ভেসে যেত। শেষ পর্যন্ত সে আশঙ্কা দূর হ'ল—বাঁধ কেটে জলনিকাশের ব্যবস্থা ক'রে।

ক্রমশঃ আঁধার ঘনিয়ে এল। পথ আর দেখতে পাওয়া যায় না। কানে আসে ঝরণার ঝরঝরানী গান। পাহাড়ের সানুদেশে দরিদ্র পাহাড়ী-পল্লীতে ক্ষীণ দীপশিখা ঘনায়মান অন্ধকারে খদ্যোতের মতো মিটিমিটি জ্বলছে। গাড়ির লাইট জ্বালানো হয়েছে—সেই আলোতেই পথ দেখে-দেখে গাড়ি ছুটেছে সমুখপানে। পাহাড়ের মাথার উপরে দলে দলে শুভ্র মেঘ, আর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সহস্র নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের চকিত ঝলক।

দূর পাহাড়ে শেয়ালের কোরাস-সঙ্গীত হচ্ছে। এখানেও দেখছি শেয়াল আছে। এ-সব পাহাড়ে ভালুক ছাড়া অন্য কোনো হিংস্র বা অহিংস চারপেয়ে জন্তু আছে বলে শুনিনি। শেয়ালের ঐকতান শুনে মনে পড়ল: 'কচি-সংসদে' পরশুরামের মূল্যবান আবিষ্কারের কথা—দারজিলিং-এর পাহাড়ে বর্ধমানের মহারাজা নাকি সখ ক'রে শেয়াল ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই পথিকৃৎ ঔপনিবেশিকের উত্তরপুরুষরাই আজ সিকিমের পাহাড় অবধি ছড়িয়ে পড়েছে—হবেও বা।

সন্ধ্যার আব্ছা অন্ধকারে সম্মুখের দূর পাহাড়ে অনেকগুলি আলো দেখা গেল। ঐ বুঝি গ্যাংটক—সিকিমের রাজধানী। এখন আমরা নিরবচ্ছিন্ন উপরের দিকে উঠছি—গাড়ি চলেছে ফুল গীয়ারে শীতের প্রকোপ বাড়ছে বেশ টের পাচ্ছি।

আধখোলা চলন্ত জীপে হুহু হাওয়া লাগছে। ওভারকোটটা গায়ে ভাল ক'রে জড়িয়ে নিয়েছি। নাঃ, গ্যাংটক পৌঁছে চাই আগুনের তাপ আর গরম চা।

রাত আটটায় গ্যাংটক পৌঁছলাম। শরীর অবসন্ন—শীতে জরোজরো। সেই বেরিয়েছি কোন্ সকালে। পথে মাত্র ঘণ্টা-দু'এর জন্য থেমেছিলাম—আহারাদির তাগিদে। বেশিরভাগ পথই এসেছি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। যখন গ্যাংটক এসে হাজির হ'লাম তখন ক্ষুধা ও শীত দুই-ই বেশ প্রবল। সরকারী অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা পূর্বাহ্লেই লিখে ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু অকুস্থলে এসে দেখা গেল অতিথিশালার দ্বার তালাবদ্ধ। চৌকিদার অনুপস্থিত। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। শেষে চৌকিদারগৃহিণী এসে মুশকিল-আসান করল বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরের অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত ঘরটা আবর্জনায় পূর্ণ। রান্নাঘরের চুলোটা ভাঙা। অত রাতে কোথায় পাই চুলো—আর, কী ভাবেই বা আগুন ধরিয়ে একটু গরম জল আর জঠরানল নির্বাপিত করার কিছু আহার্য প্রস্তুত করি—এই হ'ল সমস্যা। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট আছে। সুইচবোর্ডে একটা প্লাগ-পয়েণ্টও খুঁজে পাওয়া গেল। করিৎকর্মা অধীর বন্ধু কোথা হ'তে একটা স্টোভ জোগাড় ক'রে আনলেন। তাই সে-রাত্রে নেহাত প্রাণটা বাঁচল। বেশ শীত। কিন্তু লেপ-কম্বল দুই-ই সঙ্গে এনেছি—শীতের ভয় কি? একটা পাহাড়ের রিজ-এর (ridge) উপর অতিথিশালা। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের থাকে থাকে গ্যাংটক শহর নৈশ আলোকমালায় নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। চারদিকেই পাহাড় আর পাহাড়। কৃষ্ণপক্ষের তিমিরময়ী

রাত্রি—দূর পাহাড়ের চূড়াগুলি যেন জমাট অন্ধকারে দিগ্ব্যাপ্ত অচলায়তন। উপরের আকাশ ঘোলাটে অন্ধকার—মেঘে মেঘে সমাচ্ছন্ন। তিমিররাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার বিদীর্ণ করে দূরে দূরে পাহাড়ী বস্তীর দু'একটা আলো মিটিমিটি করে। দূর পাহাড়ের জঙ্গল হ'তে শিবাকুলের সুতীব্র ঐকতান শুনা যায়। দিনের আলো নিভে যাওয়ার সাথে-সাথেই পার্বত্য জনপদে নিষুতিরাত নেমে আসে। শীতের প্রকোপে যে যার ঘরে খিল দেয়। দোকান-পাট, পথঘাট জনবিরল হয়। মানুষের কর্মচাঞ্চল্য থেমে যায়। মনে হয়, আকাশ হ'তে নেমে-আসা এক কালো ঘুমের চাদরে গ্যাংটক শহরটাই যেন ঢাকা পড়েছে। আর বেশীক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সুখকর নয়। হিম পড়ছে। হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে—হাতদু'টো যেন অসাড় হয়ে আসছে। সুতরাং মানে মানে ঘরে ফিরে বিছানায় আশ্রয় নেওয়াই শ্রেয়স্কর।

পরদিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। মাথার দিকের বড় কাঁচের জানালাটা একটা পুরু পর্দায় ঢাকা। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই হাত বাড়িয়ে পর্দাটা সরিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবার ইচ্ছা। জানালার কাঁচে লেগে রয়েছে কুয়াশার ঘন আবরণ। বাইরের কিছুই দেখা যায় না। অতএব উঠতে হ'ল। একফালি ন্যাক্ড়া দিয়ে জানালার কাচ মুছে নিলাম। স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে দূর পর্বতের হেমশীর্ষ দৃষ্টিগোচর হ'ল।

এই সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা—স্বমহিমায় সমুন্নত। সপ্তাশ্ব সূর্যরথ তখনও উদয়গিরির অন্তরালে। চিরতুষার কাঞ্চনজঙ্ঘায় পড়েছে উদয়গামী অরুণের বিচ্ছুরিত রক্তিম আলোকচ্ছটা। কাঞ্চনজঙ্ঘার

এই রূপ যেন অপাপবিদ্ধা কুমারীর রূপ। এই সৌন্দর্য-সমুদ্র সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

দারজিলিং পাহাড়ে আসে দলে দলে বিলাসী মানুষের দল। সখের ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে টাইগার হিল-পরিক্রমায় যায়। দারজিলিংএর পাহাড় সস্তা পণ্যের ন্যায় ইতরজনের ভোগ্য। কিন্তু শ্যামাদ্রি-শিখরে ঘন মেঘাবগুণ্ঠন ভেদ করে তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ ঐ যে কাঞ্চনজঙ্ঘা আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে ক্যামেরা-ফোকাস্ সচরাচর বড় একটা হয় না। গ্যাংটক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে স্পষ্ট সরাসরি দৃশ্যটি চোখে পড়ে তেমনটি নাকি আর কুত্রাপি হয় না। সুখের বিষয়, গ্যাংটকে সখের পর্যটকদের ভীড় নেই বললেই চলে।

গ্যাংটক শহর থেকে দু'দিকে দুটি পথ উঠে গেছে। একটি হচ্ছে ঐতিহাসিক তিব্বতের পথ, আর একটি গেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। এই কাঞ্চনজঙ্ঘা-সড়ক ধরেই অভিযানকারীর দল এগিয়ে যায় উদ্ধত আকাশছোঁয়া তুষারমৌলি হিমাদ্রির দিকে। অনেকদূর অবধি সড়কটা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে উঠে গেছে। তার পর আর সড়ক নেই। দুঃসাহসী অভিযানকারীর দল তখন বন্ধুর তৃণগুল্মবিহীন রুক্ষ পথে আরও এগিয়ে চলে ; তার পর আসে বরফের রাজ্য। চিরতুষারের দেশ। এ-পথে মানুষ দূরের কথা—মনুষ্যেতর জীবেরও সন্ধান মেলা দুষ্কর। তবে কাল্পনিক তুষার-মানব (snow-man) নিয়ে গল্প-গবেষণার বিরাম নেই। হিমবাহ (glaciers) অঞ্চল অতিক্রম ক'রে আরো উত্তুঙ্গ উচ্চে আরোহণ করতে হবে—ধীর পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় অভীপ্সিত লক্ষ্যের দিকে। সূর্যকিরণ-সম্পাতে কাঞ্চনবর্ণ

কাঞ্চনজঙ্ঘা তার বিরাট মহিমময় মূর্তিতে বিরাজমান—এ যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণ, এক অপ্রত্যাখ্যানীয় আহ্বান: এসো দুর্বার দুঃসাহসিক দল—প্রকৃতির এই উদ্ধত দম্ভের সমুচিত উত্তর দাও! ওই অগম্য, অস্পৃষ্ট শৃঙ্গশীর্ষে উত্তোলন করো তোমার জয়ধ্বজা—প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের অবিসম্বাদী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করো! তাই বার বার ছুটে আসে জগতের নানা দেশ হ'তে দুরন্ত মানুষের দল এই অসম্ভবের আহ্বানে, গ্রহণ করে ওই চ্যালেঞ্জ। বার বার নিস্ফল হয় তাদের প্রয়াস, কিন্তু নিরুদ্যম হয়না মানুষ। চিরনিঃসঙ্গ, চিরনীরব ওই হিমালয়ের চূড়াগুলি। এই অপরিসীম নিথর নৈঃশব্দ্যের সান্নিধ্যে মানুষের মনে ঘটে এক অপরূপ ভাবান্তর। পৃথিবীর ধূলা-মাটির বহু ঊর্ধ্বে এই অনন্তরূপিণী প্রকৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মানুষ তার নিজ সত্তার স্বরূপ বুঝি উপলব্ধি করতে পারে। তাই ধ্যানধারণা ও নীরব সাধনার পক্ষে হিমালয়াঞ্চল এতো অভিপ্রেত, এতো মুনিজনবাঞ্ছিত।

কবির কথাগুলি কী সুন্দর, কী ভাবগর্ভ!—

"—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্ত কুমারীব্রত, হিমবস্ত্র-পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত—"

* * *

কিন্তু আর না। এবার ফেরা যাক। হিমের রাজ্য এখনও

বহু দূরে। আমরা এসেছি বাঁধা সড়কের শেষ প্রান্তে—এর পর আর মানুষের তৈরী পথ নেই। কিন্তু দূর হ'তেই তুষারদেবতার হিমশীতল করস্পর্শের যেটুকু আভাষ পাচ্ছি তাতেই যথেষ্ট! 'ডিগ্‌সুই'-এর সড়ক ধরে আমরা এগিয়েই যাচ্ছিলাম। এবার হুঁশ হ'ল, তাইতো, আমাদের এ-কী নিরুদ্দেশ যাত্রা! আমরা তো আর কাঞ্চনজঙ্ঘা-বিজয়াভিলাষী বীরের দল নই। এ অকারণ আস্ফালন আমাদের পক্ষে অশোভনীয়। এবার নিচের দিকে ফিরে চললাম। পথ আঁকাবাঁকা। প্রতি মোড়েই বিপদের আশঙ্কা। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে পড়ল একটা চালকহীন টাট্টু ঘোড়া। আমাদের জীপের আওয়াজে চম্‌কে গিয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছে। পাহাড়ী টাট্টুগুলি পথ চলবার সময় পর্বতপ্রাচীরের ধার ঘেঁষে চলে না, কেননা তাতে পাথরের সঙ্গে দেহের ঘর্ষণ লাগবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তারা চলে ঠিক পার্শ্ববর্তী খাদের ধার ঘেঁষে। ঘোড়াগুলির অনুভূতি (horse-sense) খুব বেশী, সহজে পা হড়কে খাদে পড়ে না। ঐ টাট্টুটাও তেমনি ছুটতে লাগল। আমার ভয় পাছে ঐ জলজ্যান্ত জীবটা খাদে পড়ে প্রাণ হারায়। আস্তে আস্তে জীপ চলছে, ঘোড়াটাও ছুটছে—পথ ছাড়ে না। পথ ছাড়েই বা কী করে!

এইভাবে মাইল দুই চলার পর আর একটা রাস্তা পাওয়া গেল, ঘোড়াটাও সেই পথ ধ'রে আমাদের পথ ছেড়ে দিল। এতক্ষণে খেয়াল হ'ল গ্যাংটক ছেড়ে অনেকদূর এসে পড়েছি। ডিগ্‌সুই-এর পথ ধ'রে আরও খানিকটা দূর এগিয়ে গেলে পথিপার্শ্বে একটা ইংরেজী ও তিব্বতী ভাষায় লেখা নোটিশের দিকে নজর পড়ল। রাস্তাটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। মূল সড়ক হ'তে একটা

শাখা-সড়ক চলে গেছে আর একটা পাহাড়ের দিকে। তারই মুখে এই নোটিশ : Trespassers will be prosecuted। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। শুনলাম একটা চটকদার কাহিনী। সিকিম রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলে তিব্বতীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত। কোনো রাজবধূ বাপের-বাড়ি তিব্বতে বছর দু'তিন যাপন করে যখন ফিরে এলেন তখন দেখা গেল তাঁর শূন্য কোল জুড়ে রয়েছে একটি খোকা—ক্ষেত্রজ সন্তান। সিকিম-তিব্বতীয় সমাজে ক্ষেত্রজ সন্তান অবৈধ নয়, বিশেষ ক'রে যদি সে-সন্তান কোনো লামার ঔরসজাত হয়। সিকিম-তিব্বতের সমাজে লামার খাতির ও সম্মান অত্যধিক। দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা যখন সিকিমের মধ্য দিয়ে ভারতে আসেন, সে সময় তাঁরা পথের কিয়দংশ ঘোড়ার পিঠে চড়ে এসেছিলেন। যে পথে দালাই লামার বাহন চলেছে সেই পথই পবিত্রীকৃত হয়ে গেছে—আর সেই পথের ধূলা হয়েছে পূত রজঃ। যে ঘোড়ায় ঈশ্বরাবতার দালাই লামা আরোহণ করেছিলেন—ভক্তিবিহ্বল মানুষ সেই ঘোড়ার চোনা পর্যন্ত পবিত্রজ্ঞানে জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করেছে। ভক্তির কী অদ্ভুত পরাকাষ্ঠা!

কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্রের বৈধতা সামাজিক স্বীকৃতি পেলেও, সেই রাজবধূটি রাজপ্রাসাদে আর ঠাঁই পেলেন না। তাঁকে সসম্মানে নির্বাসিত করা হ'ল দূর ডিগ্‌সুই-সড়কের নির্জন প্রান্তে। পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা প্রহরী-বেষ্টিত এক প্রাসাদে তদবধি স্বামিসঙ্গবঞ্চিতা এই নারী একক জীবন যাপন করে আসছেন। ডিগ্‌সুই-সড়ক ধ'রে আবার গ্যাংটক ফিরে এলাম। বেরিয়েছি সেই সাত-সকালে, এখন বেলা প্রায় পড়-পড়।

বৃটিশ আমল থেকে আজ অবধি প্রকৃতপক্ষে সিকিম ভারত গভর্নমেণ্টের আশ্রয়াধীন। ভারত গভর্নমেণ্টের পলিটিক্যাল এজেণ্ট রয়েছেন গ্যাংটকে। তাঁর মাধ্যমেই ভারত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সিকিম দরবারের যোগাযোগ। এই পলিটিক্যাল এজেণ্ট-ই আবার তিব্বতের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। আমি যখন গ্যাংটকে তখন পলিটিক্যাল এজেণ্ট শ্রী এ. বি. প্যাণ্ট লাসা গেছেন।

একদিন লাসার পথে বেশ খানিকটা দূর এগিয়ে গেলাম। গ্যাংটকের অনতিদূরে ইম্‌চে গোম্ফা (বৌদ্ধমন্দির)। গোম্ফায় আছে ভগবান বুদ্ধের প্রতিমূর্তি—গিল্টিকরা দারুনির্মিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। গোম্ফায় লামারা থাকেন এবং গোম্ফার যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। গোম্ফাগুলি আবার ভাবী লামাদের স্কুল। দেখলাম কিশোরবয়সী ১০।১২টি শিক্ষার্থী প্রধান লামার কাছে লামাগিরির শিক্ষানবীসি পাঠ গ্রহণ করছে। ইম্‌চে গোম্ফায় সিকিম সরকারের শিক্ষা-বিভাগ ভাবী লামাদের সাধারণ শিক্ষার কিছুটা ব্যবস্থাও করেছেন। অর্থাৎ লামাগিরি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নেপালী ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। গ্যাংটক-লাসা সড়ক ধ'রেই দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা গ্যাংটক হয়ে ভারতাভিমুখে এসেছিলেন। লাসা থেকে গ্যাংটক দীর্ঘ পথ। লাসা থেকে খানিকটা পথ জীপ বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানে আসা চলে। কিন্তু তার পর হতেই পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়ার পিঠে চলতে হবে—পথ অতি কর্কশ ও বন্ধুর। দালাই লামাকেও ঘোড়ার পিঠে চড়ে এই পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। তার পর অবশ্য আবার জীপ চলবে। লাসার পথ ঐতিহাসিক পথ। এই পথেই

ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী হিমালয়ের তুল জ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে তিব্বতে প্রবেশ করেছিল। এই পথ দিয়েই পদব্রজে চলেছিলেন বাঙালী মনীষী অতীশ-দীপঙ্কর—

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।

তিব্বত-সীমান্তে অতীশ পেয়েছিলেন রাজকীয় সম্বর্ধনা,—ধ্বনিত হয়েছিল স্বাগত-সম্ভাষণঃ ওঁ মণিপদ্মে হুম্। এই পথ-পরিক্রমায় এসে সেই বিগতদিনের ইতিহাস যেন মানসপটে মূর্ত হয়ে উঠল।

* * *

লাসার পথে খুব বেশীদূর এগুনো সম্ভব হ'ল না। সিকিম ও সিকিমের আশেপাশে পাহাড় ও গাছপালা স্নিগ্ধ ঘনশ্যাম, কিন্তু লাসার পথে যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই গাছপালাবিহীন হাড়পাঁজর-বের-হওয়া রুক্ষ পাহাড় চোখে পড়বে। পথে দেখবার-ই বা কী আছে! কিছুদূর অন্তর-অন্তর পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাহাড়ীদের ছোট ছোট বস্তী—নোংরা, অসুন্দর আর দৈন্যদারিদ্র্য-চিহ্নাঙ্কিত। এ-সব অঞ্চলে জীবিকানির্বাহের উপায় বড় স্বল্প। পাহাড়ের গায়ে থাক কেটে কেটে অল্পস্বল্প চাষ হয়—ধান, ভুট্টা ও তরি-তরকারি। মাঝে মাঝে কমলালেবুর বাগান। দারজিলিং সিকিম প্রভৃতি অঞ্চল হ'তে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু চালান হয় কলকাতায়। তিস্তা হ'তে গ্যাংটক আসবার পথে পড়ে রংপো বাজার। পাহাড় থেকে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে কমলালেবু বোঝাই হয়ে রংপো বাজারে এসে জমা হয়। আর এখান থেকে বড় বড় আড়তদারেরা কমলালেবু ঝুড়িতে বোঝাই ক'রে চালান

দেয়। অনেকগুলো শাঁসালো মাড়োয়ারী আড়তদারের আস্তানা দেখলাম। কমলালেবুর প্রকাশ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে দু'চারটা ফালতু নিষিদ্ধ কারবারও এরা করে থাকে। যতদূর অবধি চলে—জীপ ট্রাক্, ওয়াগন যাচ্ছে। ভারতের দিক থেকে কাপড়, তেল, চিনি, লবণ, মসলা, শৌখিন দ্রব্যাদি, মোটরগাড়ির বিচ্ছিন্ন অংশ রাশি রাশি ভারে ভারে উত্তর দিকে চলেছে। আর উত্তর দিক হ'তে আসছে ভেড়ার লোম। মোটরযান চলাচল শুরু হওয়া সত্ত্বেও এইসব পাহাড়ী পথের প্রধান বাহন টাট্টুঘোড়ার ক্যারাভানের দেখা মেলে। ঘোড়াগুলির পিঠের দু'পাশে ভারী ভারী বোঝা—খুটখুট ক'রে চলেছে অনলস পদক্ষেপে। অসাধারণ পরিশ্রমী এই জীব। আমরা পাহাড়ী পথে দু'চার কদম চড়াই উঠতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ি, অথচ এই নাতিবৃহৎ ঘোড়াগুলি অনলসভাবে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে। ক্যারাভানওয়ালা তিব্বতীরাও পথচলায় খুব পোক্ত। ওরা দিনে পনরো থেকে বিশ মাইল অবধি টাট্টুগুলির সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে।

একটা ঘটনার কথা বলি। একটা মালবোঝাই ট্রাক যাচ্ছে। মালবোঝাই দিয়েছে পর্বতপ্রমাণ – গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে যেমনটি হামেশা দেখা যায়। সেই মালের উপর বসে আছে এক মুনাফাখোর পশ্চিমা শেঠ। তার মাথার পাগড়ির ভাঁজে ভাঁজে প্রচুর আমেরিকান ডলার—এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে পাচার হচ্ছে মহামূল্য মার্কিন-মুদ্রা। একটা লোহার পুল পেরিয়ে যাবার সময় উপরের ইস্পাতের ফ্রেমে সজোরে আঘাত লাগে সেই শেঠজীর পাগড়ি-সমেত মাথায়। আঘাতটা এতই প্রচণ্ড আর

মারাত্মকভাবে লেগেছিল যে, তার মাথাটা স্কন্ধচ্যুত হয়ে নিচে প’ড়ে যায়। গাড়ির সহযাত্রীরা কেউ লক্ষ্য করেনি। শেঠজীর গতপ্রাণ রক্তাপ্লুত দেহটা ট্রাকের মালের উপরেই পড়ে ছিল, কিন্তু স-পাগড়ি ছিন্নমুণ্ডটি পড়েছিল পিছনের রাস্তায়। পাগড়ির ভিতর থেকে বেরিয়েছিল হাজার পাঁচেক ডলার।

লাসার পথে আর বেশীদূর এগুনো হ’ল না। পথ ও পার্শ্ববর্তী পার্বত্য দৃশ্য ক্রমশঃই হৃতশ্রী এবং অনাকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। শৈত্যও ক্রমবর্ধমান ; অতএব পশ্চাদপসরণই শ্রেয়ঃ। অনেক কষ্টে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার গ্যাংটক অভিমুখে রওনা দিলাম।

হিমালয়ের কোলে ভারতের সীমান্ত সিকিম-রাজ্য। ছোট্ট রাজ্য, কিন্তু রাজা ও রাজপাটের মহিমা বড় কম নয়। সামরিক দিক দিয়েও সিকিমের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সিকিমের একদিকে ভুটান রাজ্য, আর একদিকে নেপাল। সিকিম আবার ভারত-তিব্বতের মধ্যবর্তী বাফার (buffer) রাজ্য। রাজ্যের আয়তন কিঞ্চিদধিক ২,৮০০ বর্গমাইল, আর জনসংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মাত্র। রাজ্যের মোট রাজস্ব প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। রাজ্যের শাসনবিধানে রাজার স্থান সবার উপরে—তবে সেটা মুখ্যতঃ আনুষ্ঠানিক। বাস্তবক্ষেত্রে শাসন-পরিচালনার সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেওয়ানসাহেবের। শ্রী এন. কে. রুস্তমজী, আই-সি-এস হচ্ছেন দেওয়ান। সিন্ধু-অঞ্চলের লোক, বয়সে এখনও তরুণ, সদালাপী ও সদাহাস্যময় পুরুষ! দেওয়ানজীর সদর দপ্তরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম—প্রায় দু’ঘণ্টা শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে নানা আলাপাদি হ’ল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে রুস্তমজীর খুব কৌতূহল।

· গ্যাংটক শহরে আছেন ভারত-গভর্নমেণ্টের পলিটিক্যাল এজেণ্ট। পলিটিক্যাল এজেণ্ট ব্রিটিশ আমল থেকেই আছেন। ইনি আবার তিব্বতে দালাই লামার দরবারেও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। পররাষ্ট্রীয় যে-কোনো ব্যাপারেই সিকিম সরকারকে পলিটিক্যাল এজেণ্টের মারফত ভারত-গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পত্রালাপ ও আলোচনাদি করতে হয়। বৈদেশিক ব্যাপারে সিকিম সরকার পুরোপুরি ভারত গভর্নমেণ্টের প্রভাবাধীন। আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্যে সিকিম সরকার অনেকটা স্বয়ংপ্রধান। দেওয়ানজী অবশ্য ভারত-সরকারেরই স্থায়ী চাকুরে, এখানে ডেপুটেশনে রয়েছেন। দেওয়ান ছাড়া আছে একটা এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল। একজন চীফ সেক্রেটারি এবং দুইজন কাউন্সিলর নিয়ে এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত। এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত করেন মহারাজা নিজে। দেওয়ানজী হচ্ছেন এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতি। শাসন-ব্যবস্থায় দেওয়ানজী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর স্থানাধিকারী। ১৯৫১ কি ১৯৫২ সনে সিকিমে একটা সাময়িক গণ-অভ্যুত্থান (coup d' etat) হয়েছিল। নেতৃস্থানীয় কয়েক জন লোক মহারাজাকে বাধ্য করেছিলেন এক 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিসভা গঠন করতে। তথাকথিত জনপ্রিয় নেতারা দিনকয়েকের জন্য মহারাজাকে কোণঠাসা করে শাসন-কর্তৃত্ব দখল ক'রে নিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ভারত-সরকারের কাছে খবর গেল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এসে যথাসময়ে গ্যাংটক বাজারে উপস্থিত হ'ল। জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কালও ফুরিয়ে এল। মন্ত্রীরা পদচ্যুত হলেন। তদবধি এক মনোনীত এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল মহারাজাকে শাসন-পরিচালনায় সাহায্য করে আসছে।

বয়সাধিক্যের দরুন মহারাজা শাসন-ব্যাপারে নিজে খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ না ক'রে মহারাজকুমারের উপরেই রাজকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মহারাজকুমার বয়সে তরুণ, কর্মঠ ও পিতার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। মহারাজকুমারের সম্প্রতি পত্নীবিয়োগ হয়েছে। এখনও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি।

সিকিমের বর্তমান মহারাজা হিজ হাইনেস স্যার টাসি নামগ্যায়েল, কে-সি-এস-আই চল্লিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করে আসছেন। এঁর রাজত্বের প্রথমদিকেই বাংলার তদানীন্তন লাটবাহাদুর লর্ড রোনাল্ডসে সিকিম-পরিভ্রমণে এসেছিলেন। হিমালয়াঞ্চলে ভ্রমণকালে পর্বতের সানুদেশে নিদারুণ বজ্রপাত হয়। সেই ঘটনার সূত্রেই লর্ড রোনাল্ডসের ভ্রমণ-গ্রন্থের নামকরণ হয়ঃ The Land of Thunderbolts। মহারাজের বয়স চৌষট্টি বৎসর। ক্ষীণকায় ও খর্বাকৃতি। শুনলাম মহারাজার সময়জ্ঞান নাকি অত্যন্ত প্রখর। কোনো অনুষ্ঠানে মহারাজা নিজে উপস্থিত থাকলে কাঁটায় কাঁটায় সময়মত অনুষ্ঠানের কার্যসূচী শুরু করতে হয়। ভারত-গভর্নমেণ্টের জনকয়েক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি একবার কোনো এক জরুরী বিষয়ে সিকিম-দরবারের সহিত আলোচনা করবার জন্য এসেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজা এলেন আলোচনা-সভায়। আরও অনেকে এসেছেন। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নায়ক তখনও এসে পৌঁছাননি। দেওয়ানজী প্রস্তাব করলেন—মিনিট-কয়েক অপেক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু হিজ হাইনেস নারাজ। কাজেই নায়ককে ছাড়াই আলোচনা শুরু করতে হ'ল। এম্নিতর ঘটনা আরও ঘটেছে। গ্যাংটকের সরকারী মহল তাই সময়-বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার, বিশেষ যে-ক্ষেত্রে মহারাজার উপস্থিত থাকবার কথা।

আগে থেকে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি ও এ-ডি-কং-এর (aide-de-camp) সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজদর্শনের একটা সময় নির্দিষ্ট করা গেল। সকাল দশটায় সাক্ষাৎ। নিদিষ্ট সময়ের বেশ একটু আগেই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্যাংটক শহরের একধারে একটা পাহাড়ের উপর মহারাজার প্রাসাদ। রাজ-প্রাসাদের প্রধান প্রবেশপথেই সশস্ত্র প্রহরী। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ঢুকবার মুখে প্রহরী স-বেয়নেট বন্দুক ঘাড়ে তুলে অভিবাদন জ্ঞাপন করল। এই অপ্রত্যাশিত সৌজন্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; বুঝলাম আমাদের আগমন-সংবাদ পূর্ব হতেই প্রহরীর জানা। ভিতরে ঢুকে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি তখনও দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। এই সময়টুকু কি করে কাটাই? প্রাসাদ-প্রাঙ্গণের একদিকে রাজ-গোম্ফা। অগত্যা রাজ-গোম্ফা দেখতে গেলাম। গোম্ফা-গৃহটি কাঠের তৈরী। ভিতরে ঢুকলাম। একটি প্রশস্ত কক্ষ। একপার্শ্বে বেদী। বেদীর উপর নানা কারুকার্যময় আসনে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। মূর্তির সম্মুখে সারি সারি দীপ জ্বলছে। মূর্তির সম্মুখে মেঝেতে বসে ভক্তেরা ধ্যান করে, ভগবান বুদ্ধকে জানায় প্রণতি। কক্ষে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল এক মনুষ্য-প্রতিমূর্তি বীরাসনে নিশ্চল, নিস্পন্দ। শুনেছি সিদ্ধপুরুষেরা যখন সমাধিস্থ হন তখন তাঁদের দেহের প্রাণ-লক্ষণ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ঘটত পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নাকি ঠাকুরকে সমাধিস্থ অবস্থায় পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন—ঠাকুরের হৃৎস্পন্দন ও নাড়ীর গতি সম্পূর্ণ স্তব্ধ—জীবনের কোন লক্ষণই ডাক্তারী যন্ত্রে ধরা পড়ে না। কোন অবাঙ্‌মনসাগোচর অতীন্দ্রিয় লোকে জ্যোতির্ময় পরমাত্মায়

ঠাকুরের সত্তা একান্ত বিলীন হয়ে গিয়েছে। সাধ্য কি ডাক্তারী বিদ্যা এ পরম রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে! যতক্ষণ গোম্ফা-কক্ষে ছিলাম, বার বার সেই স্থাণুবৎ প্রতিমূর্তিটি লক্ষ্য করছিলাম। এ-কি সত্যিকারের কোনো ধ্যানমগ্ন মানুষ, না অবিকল মানুষের প্রতিমূর্তি? বার বার মনে এই প্রশ্নই জাগছিল। মানুষ হলে এতক্ষণ বিস্ফারিত নিষ্পলক চক্ষে চেয়ে থাকা সম্ভব কি? চোখের পাতার বিন্দুমাত্র কম্পন নাই! আর জীবন্ত মানুষ না হ'লে এত নিখুঁত অবিকল মনুষ্য-প্রতিমূর্তি হতে পারে কি? মাথার চুল, চোখের পল্লব, চোখের মণি, হাত-পা-চামড়া অবয়বাদি—কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। অনেকক্ষণ পরে সব সন্দেহের নিরসন হ'ল। মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সাড়া জেগে উঠল। ক্রোড়স্থাপিত যুক্ত-করদ্বয় শিথিল হয়ে এল। মুখমণ্ডলের পেশীগুলি শ্লথ ও মৃদু হাস্যরেখায় উদ্ভাসিত হ'ল। বুঝলাম এতক্ষণে এঁর ধ্যান ভাঙল। ইনি হচ্ছেন রাজ-গোম্ফার প্রধান লামা। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে যুক্তকরে অভিবাদন জানালাম। তিনিও প্রত্যভিবাদন করলেন। এই সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় লামার চেহারার মধ্যে বেশ একটা আকর্ষণীয় উপাদান আছে। দেখলেই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। লামা তাঁর নিজ ভাষায় আমার উদ্দেশে কি বললেন বিন্দু-বিসর্গ কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। দোভাষীর মাধ্যমে খানিকটা কথোপকথন হ'ল। তিনি আমার পরিচয় জানতে চাইছেন। পরিচয় পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমি তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ চাইলাম। নমস্কার-বিনিময়ের পর বিদায় নিলাম।

এদিকে রাজদর্শনের সময় এসে গিয়েছে। গোম্ফা হতে বেরিয়ে দেখি প্রাঙ্গণের অদূরপ্রান্তে বারন্দায় মহারাজ ও তাঁর দেহরক্ষী

দাঁড়িয়ে। তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা। বুঝলাম মহারাজা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। ত্বরিৎপদে এগিয়ে এলাম। সিকিমের শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীস্বদেশরঞ্জন ঘোষ আমার সাথে ছিলেন। তিনিই এগিয়ে গিয়ে মহারাজার কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আগে থেকেই একখানা স্কার্ফ (ওড়না) সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এগিয়ে গিয়ে ত্ব'হাতে স্কার্ফখানা মহারাজের হাতে দিতেই মহারাজ দু'হাতে সেখানা গ্রহণ করে আমায় প্রত্যর্পণ করলেন। এ হচ্ছে সিকিমের এক বিশিষ্ট রীতি। সম্মানিত ব্যক্তিকে স্কার্ফ উপহার দিতে হয়। তবে এক মহারাজা ছাড়া আর-সকলে সে স্কার্ফ গ্রহণ করেন, মহারাজা ওটা ফিরিয়ে দেন। মহারাজা স্যার টাসি নামগায়েল বেশ ইংরাজী বলেন, কাজেই আলাপাদির কোন অসুবিধা হয়নি। রাজ-প্রাসাদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় এসে বসলাম। পরিচারক চা ও আহার্য নিয়ে এল। চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা চলতে লাগল। সিকিমের বিগত দিনের কথা ও বর্তমান উন্নয়ন-পরিকল্পনা নিয়েই বেশী কথা হ'ল। মহারাজা নিজে একজন চিত্র-শিল্পী—ছবি এঁকে অবসর সময় যাপন করেন। ভারতীয় চিত্র ও ইউরোপীয় চিত্রকলার মূল পার্থক্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা হ'ল। বলা বাহুল্য, চিত্রকলার জ্ঞান আমার অসামান্য! যতটা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই নিজের অজ্ঞতা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করলাম। খানিকটা সফলও হয়েছিলাম, কারণ মহারাজ আমাকে একটা বড় রকমের বোদ্ধা বা সমঝদার মনে করে নিজের স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। তাঁর বেশীরভাগ ছবিই হচ্ছে ল্যাণ্ডস্কেপ। আর সব ছবিই সস্-পেন্টিং। হিমালয়ের নানা দৃশ্য। স্টুডিওটি নাতিবৃহৎ। দেওয়াল-ভর্তি মহারাজার স্বহস্তাঙ্কিত ফ্রেমে-বাঁধাই ছবি। ঘরময়

ছবি আঁকার নানা সরঞ্জাম। খুব যত্নসহকারে ছবির পর ছবি তিনি দেখাতে লাগলেন। কয়েকটি ছবি বেশ ভালোই লাগল। মহারাজা বিদেশী বিশেষজ্ঞ রেখে চিত্রবিদ্যা শিখেছেন বললেন। নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের পক্ষে এটা মন্দ উপায় নয়। মহারাজার জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ। একমাত্র পুত্র, বয়সে তরুণ,—তাঁর কঠোর কর্মব্যস্ততা। পুত্রবধূটিও নাই। রাজবাড়ির পরিচারক-পরিচারিকারা সর্বদাই রাজসংসর্গ হতে সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট। মহারাজার সঙ্গী আর কেউ নেই। সদালাপী ও অমায়িক প্রৌঢ় ব্যক্তিটির সঙ্গীবিহীন জীবনে চিত্রকলাই এখন একমাত্র সঙ্গী। শুনা যায়, যৌবনে মহারাজার সুরাসক্তি কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। পরে একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে দারজিলিং-এর কোন বাঙালী ডাক্তারের যত্নে ও চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করেন। সেই ডাক্তারের উপদেশেই আজ সুরা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না।

রাজপ্রাসাদ হতে বেরিয়ে এলাম প্রায় বারোটায়। মহারাজার অনুমতিক্রমে একসঙ্গে ফটো তোলা হ'ল।

সিকিম রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক সংস্থান খুব বেশী কিছু নয়। রাজস্ব আদায় হয় অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। সিকিমের গঠনমূলক উন্নতি প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। ভারত-গভর্নমেণ্ট এগিয়ে এসেছেন সাহায্যকল্পে। সাতবৎসর-মেয়াদী এক উন্নয়ন-পরিকল্পনা সিকিম দরবার গ্রহণ করেছেন। তাতে শিল্পোন্নতি, শিক্ষাবিস্তার, নতুন পথঘাট-নির্মাণ, কৃষির উন্নয়ন ইত্যাদি বহুপ্রকার গঠনাত্মক কাজের স্কীম আছে। কাজও শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে যে পথে আমরা এলাম সে-রাস্তা একদিকে গ্যাংটক হয়ে চলে গিয়েছে লাসার দিকে। ইয়ারটুঙ্গ অবধি জীপ

যায়, তার পরে অবশ্য পায়দল ছাড়া চলা যায় না। আবার অন্যদিকে ডিগ্‌স্থুই হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে অনেকদূর অবধি রাস্তা গেছে। উভয় পথই তৈরী করেছেন ভারত-গভর্নমেণ্ট, এবং তার রক্ষণ ও সংস্কারও করে আসছেন ভারত-সরকার।

শিক্ষার কথা বলি। গ্যাংটক শহরে হাইস্কুল আছে দুটি। একটি ছেলেদের, অপরটি মেয়েদের। দুটি স্কুলই দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়েদের স্কুলটির প্রধানা শিক্ষিকা মিস্ প্যাটার্সন। খাঁটি বিলাতী মেমসাহেব। বিশ বৎসরের অধিককাল এদেশে শিক্ষার কাজে নিযুক্ত আছেন। দশটি ক্লাস—একেবারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। সিলেবাস পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষতের অনুমোদিত। ফাইন্যাল পরীক্ষাও পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক গৃহীত হয়। হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তিব্বতী অথবা নেপালী ভাষার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে, কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণী হ'তে ভাষা-মাধ্যম হচ্ছে ইংরাজী। তার কারণ, তিব্বতী এবং নেপালী ভাষার দৈন্য—পাঠ্যপুস্তকের একান্ত অভাব। জনসংখ্যার অধিকাংশই নেপালী ভাষী। বাকী অংশ সিকিমী-ভাষী। সিকিমী ভাষা তিব্বতী ভাষারই রূপান্তর,—হরফ তিব্বতী। নেপালী ভাষার হরফ দেব-নাগরী। নেপালীতে অল্পবিস্তর বইপত্তর কিছু কিছু আছে। সম্প্রতি নেপালী সাহিত্যের অনুশীলনও কিছু কিছু হচ্ছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নেপালী সাহিত্যিকগণকে নানা-ভাবে সাহায্য ও উৎসাহ দিচ্ছেন। সিকিমী ও তিব্বতী ভাষায় সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছু নেই; যাও আছে তা সবই বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত। সিকিম সরকারের শিক্ষা বিভাগ সম্প্রতি কয়েকখানা

সিকিমী স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন। সিকিমের নেপালী-ভাষী জনসাধারণ হিন্দু। সিকিমী-ভাষীরা বৌদ্ধ। পূজাপার্বণ, সামাজিক আচার উৎসব সবই ধর্মানুগ। গোম্ফায় গোম্ফায় প্রাচীর চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রাবলী বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা সংক্রান্ত। লামারা ধর্মশিক্ষার আনুষঙ্গিক হিসেবে চিত্রবিদ্যাও কিছু কিছু শিখে থাকে। খোদাই করা কাঠের নানা আসবাবপত্র সিকিমের স্থানীয় শিল্প। গ্যাংটকে একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল আছে। তার অধ্যক্ষা একজন বাঙালী মহিলা। টেক্‌নিক্যাল স্কুলে চিত্র-শিল্প, কাঠের কাজ ও কার্পেট-বয়ন শেখানো হয়। মেয়েদের স্কুলে শিল্প-শিক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা আছে দেখলাম। ছেলেদের স্কুলেও আছে। মেয়ে-স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা প্রত্যেক ক্লাসেই নিয়ে গেলেন। মেয়েরা তিব্বতী, নেপালী, সিকিমী আর অন্য ভাষী দু'চারজন কর্মচারীদের কন্যা বা আত্মীয়া।

প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীতেই মেয়েদের সঙ্গে ইংরাজীতে কিছু কথোপকথন করলাম। মেয়েদের বেশ চটপটে ও সপ্রতিভ বলে মনে হ'ল।

নবম শ্রেণীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলাম : What's the most important scientific discovery of the present time?

উত্তর : The Satellite Moon.

প্রশ্ন : Has that been given any special name?

উত্তর : Sputnik.

একটু বিস্মিতই হলাম। মাত্র তিন চারদিন পূর্বে রাশিয়া হ'তে এই যুগান্তকারী সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এত সত্বর সুদূর সিকিমের স্কুলের পাহাড়ী ছাত্রীরা সে সংবাদ পেয়ে গেছে, আর

এত চটপট জবাব দিল তাতে বেশ আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হ'লাম বৈকি! সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিসও নজরে পড়ল। সেটা হচ্ছে—শ্রেণীতে শ্রেণীতে দেওয়ালে আধুনিক চিত্র-তারকাদের ছবি। মিস্ প্যাটার্সনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন: "Why, I don't see any objection to having these pictures of graceful girls." টীকা নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক সময়ে যে একশ্রেণীর লোক সাধারণের সর্বাধিক কৌতূহল জাগিয়ে তোলে তারা হচ্ছে ফিল্মের অভিনেতা ও অভিনেত্রী। কলকাতার রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধমাইল লম্বা কিউ দিয়ে বৃষ্টি বাদল, শীত গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে হাজারে হাজারে মানুষ সিনেমা টিকিটের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, এ তো প্রতিদিনের ঘটনা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে অভিনেত্রী দর্শনেচ্ছুর ভীড়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, পুলিস কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে অবাধ্য জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে বাধ্য হয়—এরূপ ঘটনাও ঘটে। তবে সিকিম স্কুলের ছাত্রীরাই বা কি দোষ করল? স্কুল-ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে সুন্দরী ফিল্ম অভিনেত্রী-দের ছবি টাঙিয়ে তাদের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছে মাত্র। 'স্পুট্‌নিক' আর সিনেমা-অভিনেত্রী উভয়েই আধুনিকতার প্রতীক।

সিকিমের শিক্ষা-বিভাগের কর্তা একজন বাঙালী—শ্রীস্বদেশরঞ্জন ঘোষ। শ্রীযুক্ত ঘোষ এবং ঘোষজায়া উভয়েই অতি অমায়িক ও অতিথিবৎসল। তাঁদের আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ ঘটেছিল। ঘোষজায়া নানা সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়ালেন। সিকিমের শিক্ষাসংস্কৃতি বিষয়ে ঘোষমহাশয়ের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনা হ'ল। মুখ্যত তাঁর চেষ্টা ও উদ্যোগেই সিকিমে কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং সমাজ-শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ

অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন দিয়ে কয়েকজন বাঙালী শিক্ষককেও বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেছেন।

সিকিম সরকারের নানা বিভাগে ভারতীয় কর্মচারীর সংখ্যা নেহাত অপ্রতুল নয়। স্বয়ং দেওয়ান ভারতীয়, তা ছাড়া বিভাগীয় অধিকর্তারা অনেকেই ভারতীয়, এঁদের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই বেশী। আর মজা হচ্ছে, যে বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তা যে-জাতের, সেই বিভাগে সেই জাতের লোকই সংখ্যায় বেশী। অধিকর্তা-মহাশয় নিজের জাত-ভাইদের দিয়ে বিভাগ ভর্তি ক'রে তুলতে সর্বদাই সচেষ্ট। এ-বিষয়ে পাঞ্জাবীদের জুড়ি নেই। সিকিমের বাস্তুকর্ম (Works and Buildings) এবং বিদ্যুৎ (Electricity) বিভাগ পাঞ্জাবীদের প্রায় একচেটিয়া, যে হেতু চীফ ইঞ্জিনীয়ারদ্বয় পাঞ্জাবী। আরও দু'একটি বিভাগ সম্বন্ধেও মোটামুটি এ কথা বলা যেতে পারে। আর এতে কারও কোন আপত্তিও বিশেষ কিছু নেই। কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে বাঙালীর বেলায়। শ্রীযুক্ত ঘোষ জন-দুই ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাঙালী শিক্ষক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করেছিলেন, আর তক্ষুনি 'গেল গেল, সব গেল—শিক্ষা-বিভাগ বাঙালীর একচেটিয়া হয়ে গেল'—এই রব উঠল। আর সেই রব উঠল অ-বাঙালী ভারতীয় মহল হ'তে। এ ব্যাপারটা কেবল যে সিকিমেই ঘটেছে তা নয়, সর্ব-ভারতের পরিপ্রেক্ষিতেও বোধ হয় কথাটা খানিকটা সত্য। বাঙালীর প্রতি বিদ্বেষ ও বিরূপতা যেন কতকটা সর্বজনীন। প্রতিবেশী বিহার, আসাম, উড়িষ্যা এঁরা তো আছেনই—মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী ও দক্ষিণীরাও বাঙালী বিদ্বেষে বড় কম যান না। বাঙালীকে কোণঠাসা করতে সবাই যেন বদ্ধ-পরিকর। পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল বাঙালীদের পুনর্বাসন ব্যাপারেই এর

বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সারা ভারত আজ যে স্বাধীনতার সুখ-সুবিধা ভোগ করছে সে-স্বাধীনতা-অর্জনে বাঙালীর সংগ্রাম, দুঃখবরণ ও ত্যাগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কোন্ অপরাধে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের আজ এই শোচনীয় অবস্থা,—নিজ বাসভূমে অর্থাৎ পাকিস্থানে তারা ক্রীতদাস-স্বরূপ, আর ভারতে তারা অবাঞ্ছিত। ভারত-বিভাগের ভিত্তিতেই আমাদের স্বাধীনতা। আর দেশ-বিভাগ-জনিত যত দুঃখ সবই বাঙালীর। বেশ আছেন আমাদের বিহারী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী ভায়েরা। দেশ-বিভাগ-সম্ভূত দুঃখ-ক্লেশ তাঁদের কেশাগ্রটুকু স্পর্শ করেনি, অথচ স্বাধীনতার সবটুকু রস তাঁদেরই ভোগ্য। চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, গলাবাজি, চালবাজি, সব-কিছুতেই এঁদের সিংহের ভাগ।

বাঙালীরও যথেষ্ট দোষ আছে। বাঙালী মারাত্মক স্বজাতি-বৈরী। সিকিমের শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত ঘোষ দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন: কয়েকটি বাঙালীকে শিক্ষা-বিভাগে চাকুরি দিয়ে একদিকে তিনি অবাঙালী ভারতীয়দের অপ্রীতিভাজন হলেন, আবার অন্যদিকে সেই বাঙালী সহকর্মীরাই তাঁর বিরুদ্ধে নানা বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে তাঁকেই অপদস্থ করার চেষ্টা করল। কার্যতও দেখলাম, চার-পাঁচঘর মাত্র বাঙালী পরিবার আছে—তাদের মধ্যে সম্প্রীতির একান্ত অভাব। পারলেই, একে অপরের অনিষ্ট করবার সুযোগ বড় একটা ছাড়ে না। এ-হেন জঘন্য মনোবৃত্তি যে কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই কলঙ্কজনক ও অহিতকর। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে হ'লে বাঙালীকে সর্বাগ্রে দুটো জিনিসের উপর জোর দিতে হবে: একটা হচ্ছে বাঙালী-প্রীতি। এ-দ্বারা অ-বাঙালীর প্রতি অ-প্রীতি বুঝায় না। আর দ্বিতীয়টি

গ্যাংটকের বাজার
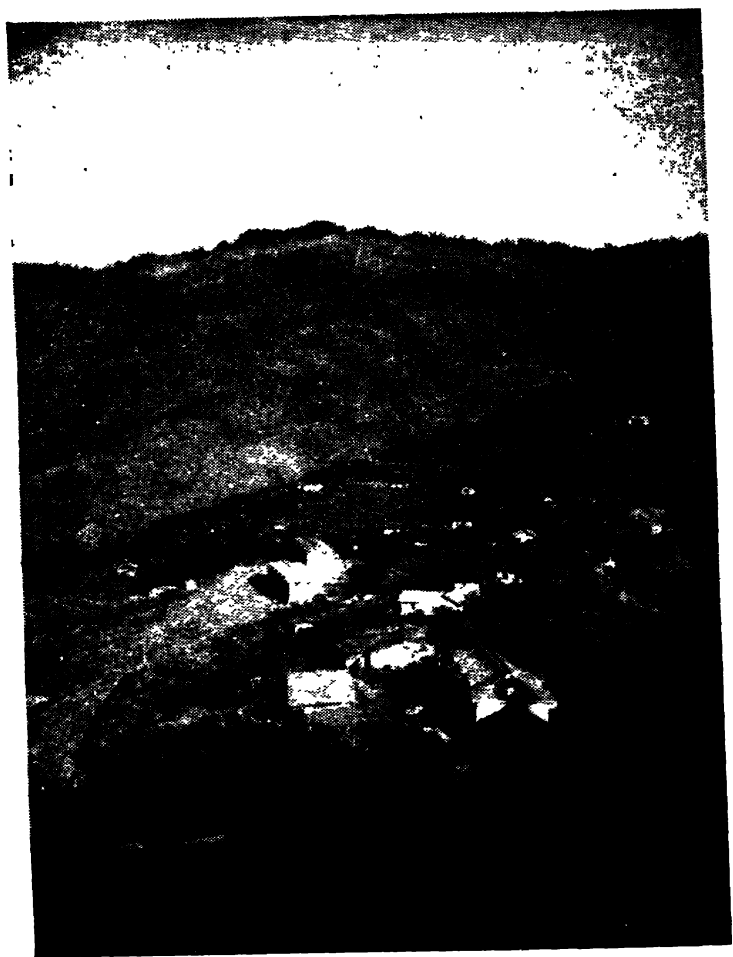
হিমালয়ের কোলে সুন্দর গ্যাংটক শহর

হচ্ছে মানীর মান রক্ষা করা, অর্থাৎ যোগ্য নেতাকে মর্যাদা দান। শিশু, বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী প্রত্যেককেই এ দু'টি বিষয়ে অবহিত করে তোলা শিক্ষার একটি বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সিকিম থেকে ফেরার দিন এসে গেল। এখানকার যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার কথা তাঁদের সবার সাথেই দেখা হ'ল। সবাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই আলাপ-আলোচনাদি করলেন। চীফ-সেক্রেটারি শ্রীদেনাপ্পা, শিক্ষা-সচিব (Executive Councillor for Education) শ্রীকাশীরাজ প্রধান, ভারতীয় দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মচারিগণ প্রায় সবার সঙ্গে দেখা করলাম। শ্রীকাশীরাজ প্রধান তাঁর বাসভবনে চা-পানের আমন্ত্রণ জানালেন। শ্রীমতী প্রধান ও প্রধান-কন্যা স্বহস্তে চা ও আহার্য পরিবেশন করে আপ্যায়িত করলেন। স্থানীয় স্কুল, গোম্ফা যে-কয়টি আছে তাও পরিদর্শন করা শেষ হ'ল।

শিক্ষার প্রসার জাতীয় উন্নতির অপরিহার্য শর্ত। সিকিমের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও ধর্মভিত্তিক সামাজিক কাঠামো এ-দুটো জিনিসকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েই এ-দেশের জন্য নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করা আবশ্যক। বর্তমান পরিস্থিতিতে সিকিমে শিক্ষা-প্রসারে সবার চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে কর্মী ও শিক্ষকের। শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীযুক্ত ঘোষ এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সেদিন গ্যাংটক ছেড়ে ভারতাভিমুখে রওনা হয়েছি। পথে পড়ল ঘাটেধারা। চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট জায়গা। একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী চঞ্চল নৃত্যে ফেনোচ্ছ্বাস তুলে খরবেগে ছুটে

চলেছে। ঘাটেধারা একটা দ্বীপের মতো। একটা পাহাড়ী নদী এর তিনদিক বেষ্টন করে রয়েছে। চারিদিকে পাহাড়ের শ্যামলিমা, তারই মাঝখানে শ্যাম সমতলভূমি—আর সেইখানেই একটা পাঠশালা। সিকিমের শিক্ষা-প্রসার পরিকল্পনায় নূতন নূতন পাঠশালা স্থাপন করা হচ্ছে। ঘাটেধারা পাঠশালাটি তারি অন্যতম। এখানে কিছুক্ষণের জন্য থামলাম। পাঠশালা-গৃহটি ঢেউ-খেলানো টিন ছাওয়া, আর পাকা মেঝের ঘর। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এরই মধ্যে বেশ হয়েছে। ঘাটেধারার আশেপাশে বস্তী বড় একটা নেই।

পাঠশালা-গৃহের সংলগ্ন প্রধান শিক্ষকের বাসা। প্রধান-শিক্ষকের স্ত্রীও শিক্ষিকা। দুজনে একত্রে কাজ করেন। আমরা আগে সংবাদ দিয়ে যাইনি। যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে—শিক্ষক-দম্পতি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমাদের একটু চা-খাওয়াবার জন্য। পাঠশালার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দোভাষী মারফত কিছু কিছু কথাবার্তা চালাতে লাগলাম। প্রধান শিক্ষক ম্যাট্রিকুলেট ও শিক্ষণপ্রাপ্ত; তাঁর সঙ্গে ইংরাজীতেই কথাবার্তা হতে লাগল। ইতিমধ্যেই শিক্ষকগৃহিণী চায়ের যোগাড় করে ফেলেছেন। ওঁদের থাকবার ঘরটিতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বড় ভালো এঁদের অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহার। অতি অল্প সময়ের জন্যই এসেছি, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে তাঁরা তাঁদের আপনার জন করে নিয়েছেন—নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ অকপটে ব্যক্ত করলেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আরও পড়াশুনা করবার ইচ্ছা। তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছা শিল্পকার্যে ভাল ট্রেনিং নেবার। এঁদের বয়স অল্প—আমি এঁদের মৌখিক উৎসাহ দিলাম। এঁদের বেতন স্বল্প, কিন্তু রুচি অতি উত্তম। পাঠশালা-গৃহটির চারপাশে

নিজহাতে ফুলের বাগান লাগিয়েছেন। নিজেদের থাকবার ও রান্নার ঘরটি অতি পরিষ্কার ও পরিপাটী সাজানো-গুজানো। তখন-তখনি বাগান থেকে প্রচুর গাঁদাফুল তুলে মালা গেঁথে আমাদের সম্বর্ধনা করা হ'ল। বড় খুশী হলাম এঁদের ব্যবহারে।

পিছনে পড়ে রইল ঘাটেধারা। পিছনে পড়ে রইল সিকিমের শ্যাম শৈলশ্রেণী। এগিয়ে চলেছি কালিম্পঙের দিকে। ক্রমে তামসী রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দিক ছেয়ে গেল। বিশ্বভুবনময় এক গভীর প্রশান্তি। নিরবচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ্যকে যেন আরও নিবিড়তর করে তুলেছে পতনশীল ঝরণার ঝরঝরানি আর গতিক্লান্ত জীপ্ গাড়িটার একটানা গোঙানি।

যে দেশে যাওয়া মানা

ঘনায়মান অন্ধকারে আর দূরশ্রুত পাহাড়ী ঝরণার কলতানে সে দিন যে-পথ হতে বিদায় নিয়েছিলাম আজ আবার সে-পথেই এসে দাঁড়িয়েছি। সেবারের গন্তব্য স্থল গ্যাংটক ছাড়িয়ে এবার আরও দূরে, আরও দুর্গমের দিকে পা বাড়িয়েছি। পাহাড় আর সমুদ্র ঘরকুনোকে চিরদিন ঘরের বাইরে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মানুষের রক্তে লবণের স্বাদ, আর সমুদ্রের লোনা জল—এ দু'য়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ যেন স্বাভাবিক। অটল মৌন হিমাদ্রি চির নীরব, চির নিরুত্তর—মানুষের অন্তরের গভীরেও চির নিস্তব্ধতা। তাই কি ধ্যানগম্ভীর তুষার-শীর্ষ শৈলশ্রেণীর প্রতি মানুষের অন্তরের সহজ আকর্ষণ? ওই অসীমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যেন বিশ্ব-রহস্যের ক্ষণিকাভাস পায়।

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া ;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে সম্মুখে ধরিয়া ॥
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে মাপিয়ো না তারে।
থাক তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ সংসারের পরে ॥

সেই কলোচ্ছলা রংপো নদী। ভারত-সিকিম সীমান্তের এই জায়গাটি ভারী মনোরম। দুই প্রান্তে দিগন্তব্যাপ্ত শ্যাম শৈলশ্রেণী মধ্যে খরস্রোতা পাহাড়ী নদী রংপো। দুই তীরকে সংযুক্ত করেছে এক সুদৃশ্য লোহার ঝুলন-সেতু। এ পারে ভারতভূমি ওপারে সিকিম। সিকিমের পারে ঠিক নদীর উপর আছে একটি ছোট্ট ও পরিচ্ছন্ন বাংলো বা পান্থনিবাস। ভুটানের পথে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরু এই বাংলোতেই কিছুক্ষণ কাটিয়ে পথশ্রম অপনোদন করেছিলেন—এখানেই প্রথম সিকিম দরবার শ্রীনেহরুকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করেছিল। এখনও স্থানীয় লোকের মুখে নেহরুজীর পথ-পর্যটন কাহিনীর টুকরো খবর শুনতে পাওয়া যায়। সিকিমের মহারাজকুমার স্বয়ং রংপোতে শ্রীনেহরুকে স্বাগত জানান এবং এখান থেকে গ্যাংটক এবং তার পরেও নাথুলা অবধি নিজে জীপ চালিয়ে নেহরুকে নিয়ে যান। শ্রীনেহরুর প্রতি মহারাজা, মহারাজকুমার এবং সিকিমের জনসাধারণ একটা বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন তার বহু প্রমাণ আছে। রংপো বাংলোতে আমরাও একরাত কাটালাম। সঙ্গী দুজন—শিওদাস ঘিমিরায় আর পদ্দম প্রধান লেপ্চা। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের জীপের ড্রাইভার কৃষ্ণ সুণ্ডাস। ডাক বাংলোটিতে থাকবার ব্যবস্থা খুবই ভাল। আসবাবপত্র বাসন কোসন সবই ঝক্ঝকে তক্তকে। নেহরুজীর সাম্প্রতিক আগমনই অবশ্য এসব ব্যবস্থার মূলে।

রংপোতে একটি ছোট্ট বাজারও আছে—কয়েক ঘর স্থায়ী বাসিন্দা থাকে। উপরের রাস্তা থেকে নদীর পার বেয়ে অনেকটা নীচুতে নেমে জলের কাছে যেতে হয়। অর্থাৎ নদীর খাদ খুবই নীচু। পাহাড়ী নদীমাত্রই এই রকম গভীর খাদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বর্ষার ঢলে খাদ যখন কানায় কানায় ভরে উঠে তখন নদীর রূপ হয়ে উঠে উদ্দাম ভয়ঙ্কর। এখন শীতের মরশুম—খাদের নীচু তলা দিয়ে রংপো ফেনিল আবর্তে প্রবহমান। অদূরে বালুকাময় তীরে একদল ভারতীয় সার্ভেয়ার তাঁবু ফেলে তামা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। রাত্রে রংপো বাংলোতে আহার জুটল গরম ভাত, ডিম সিদ্ধ আর মাখন। খাবার সময় মনে পড়ল নেহরুজীর লাঞ্চের কথা—যে কথা খবরের কাগজের মারফত সারা দুনিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল। প্রধান-মন্ত্রীর খাদ্য-তালিকায় ছিল সব্জীর সুরুয়া, পোলাও, মাছ, ব্যঞ্জন এবং সর্বশেষে সিকিমের বিখ্যাত কমলা-লেবুর রস। সিকিমের কমলা-নিংড়ান রস নেহরুজীর প্রিয় পানীয়রূপে খ্যাতি অর্জন করেছে। ঘ্রাণে যদি অর্ধভোজন হতে পারে, চিন্তনে অর্ধ না হোক নিদেন সিকি-ভোজন মেনে নিতেই হবে। প্রধান-মন্ত্রীর ভোজ্য-তালিকা মনে করেই আমাদের প্রায় নিরুপকরণ ভাতের প্লেট আনন্দে নিঃশেষ করে উঠলাম। রাত্রে ঘুমালাম প্রচুর।

পাহাড়ী পরিবেশে যারা অনভ্যস্ত তারা হয়ত উপলব্ধি করে থাকবেন পাহাড়ের নৈশ-নিস্তব্ধতা কত গভীর কত অনুভাব্য! পাহাড়ে রাত্রিবেলা চারিদিকে কেমন একটা নিঃসাড় থমথমে নীরবতা বিরাজ করে—যা সমতলভূমির লোকালয়ে বুঝা যায় না। ক্বচিৎ শেয়ালের ডাক বা নিশাচর পাখীর আওয়াজ অথবা মধ্য যামে ঘুমন্ত শিশুর ক্রন্দন কিংবা অন্য কোন শব্দ কানে আসে পাড়া-

গাঁয়ের ঘরে শুয়ে। নৈশ নীরবতায় পাহাড়ের দোসর কেবল মরুভূমি। রংপো ডাক-বাংলোর ঘরে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর পর্যন্ত এই নিবিড় নৈঃশব্দ্যকে যেন দেহের প্রতি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা গেল। এই সীমাহীন শব্দহীনতায় সমস্ত দেহসত্তা আচ্ছন্ন হ'য়ে এল। ঘুমের আমেজ কত স্নিগ্ধ, কত সুখকর!

পরদিন আবার শুরু হ'ল যাত্রা। সাধারণতঃ এ পথের যাত্রীরা রংপোতে রাত্রিবাস করে না। রাত কাটায় গ্যাংটকে। আমাদের কথা একটু স্বতন্ত্র। গ্যাংটকের ডাক-বাংলোর অগোছালো অপরিচ্ছন্নতার কথা বেশ মনে আছে। তাই রংপোর নতুন অভিজ্ঞতা মন্দ লাগল না। আমরা এবার রওনা হলাম গ্যাংটক হয়ে সোজা উত্তর-পূর্বে নাথুলার দিকে। গ্যাংটকে শুধু চা-পানের জন্য ঘণ্টা আধেকের বিশ্রাম। গ্যাংটক অবধি পথের দৃশ্য আগের দেখা হ'লেও আগের মতোই অপূর্ব-দর্শন। এ-দৃশ্য কখনও ম্লান হবার নয়। মেঘ-রৌদ্রের নিত্য লুকোচুরি এই শ্যাম শৈলশ্রেণীকে বহুরূপীর সজ্জায় নিরন্তর সাজিয়ে দিচ্ছে। ঘন ঘন পট পরিবর্তন ঘটছে। এই ছিল নীল নির্মল আকাশ—মাথার উপরে তুষার ধবল শৈলশৃঙ্গ নিষ্কলঙ্ক মহিমায় উজ্জ্বল! কোথায় কি হ'ল—সব এক নিমেষের যাদুমন্ত্রে তিরোহিত হ'ল। ধোঁয়াটে মেঘে সব আচ্ছন্ন, সম্মুখের পথ আর দেখা যায় না। অতি সন্তর্পণে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে, নতুবা বিপদের আশঙ্কা। রংপোর অনতিদূরেই দিন কয়েক পূর্বে বিরাট ধ্বস নেমেছিল। তার দরুন সিকিম রোড এখনও পুরোপুরি মুক্ত হয় নি। অতি সাবধানে পাশ কাটিয়ে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'ল। আমরা ড্রাইভারের জিম্বায়

গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে হেঁটে এই বিপদসঙ্কুল পথটুকু পেরিয়ে এলাম। সামনে আবার চড়াই। এমনি কতো যে চড়াই উতরাই তার শেষ নাই। চড়াই-এর শুরুতে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বে তাকালে স্বর্গের সিঁড়ি দেখা যায়। পাহাড়ের পর পাহাড় বেষ্টন করে এঁকে বেঁকে পথ চলে গেছে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতরে। ক্বচিৎ কখনো লুপ (loop) বা প্যাঁচান দড়ির মতো পথটা নিজেকেই অতিক্রম করে গেছে। জনশ্রুতি যে, যখন দারজিলিং হিমালয়ান রেলপথ নির্মিত হচ্ছিল, তখন জায়গা বিশেষে এসে আর কিছুতেই এগোনো যাচ্ছিল না। স্থানটি এতই খাড়া যে কোনক্রমেই সেখান দিয়ে সোজা এগিয়ে যাওয়া যায় না। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব বড্ড মুশকিলে পড়লেন, কিন্তু সে বিপদের আসান ঘটালেন সঙ্গিনী মেম সাহেব ইঞ্জিনীয়ার-পত্নী। মেম সাহেব স্বামীকে ক্ষণিক বিশ্রামের অনুরোধ জানিয়ে বললেন ঃ Let us go back to come here again. "বাসনায় আগুন দে" রজক-কন্যার এই উক্তি শুনে ভক্তপ্রবর লালাবাবুর যেমন বৈরাগ্যোদয় হয়েছিল, তেমনি পত্নীর এই সহজ কথা কয়েকটির মধ্যেই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব তাঁর সমস্যা সমাধানের হদিশ পেলেন। পথটাকে ফিরিয়ে নিলেন খানিকটা পিছন দিকে তারপর একটা সুবিধা মতো জায়গা ঘুরে নিজেকে অতিক্রম করে পথটা উপরের দিকে উঠে গেল। একেই বলে লুপিং দি লুপ (looping the lcop)।

রংপো থেকে গ্যাংটক হয়ে সোজা চলে এলাম শেরপাথাং। এখানেই রাত্রিবাস। নেহরুজীও সদলবলে এখানে নৈশ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। আমরা "মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ" নীতির অনুসরণ করে চলেছি। শেরপাথাং-এর উচ্চতা প্রায় পনর হাজার

ফুট। বায়ু এখানে অতি হাল্কা। চলতে চলতে কেমন যেন বোধ হয় দম আটকে যাচ্ছে। সঙ্গে স্মেলিং সল্ট ছিল—মাঝে মাঝে তার শিশিটা শুঁকছি। রাত্রে তাঁবুতে থাকতে হ'ল। আহার—সঙ্গে আনা পাঁউরুটি, মাখন, চিনি আর গরম চা। শীত খুবই প্রচণ্ড, আবার শীতের চাইতেও মারাত্মক তুষার-শীতল কনকনে হাওয়া। আর ফিরে ফিরে বৃষ্টি। সর্বাঙ্গ বর্ষাতিদ্বারা আবৃত, ভিতরে বেশ ভাল গরম জামা কিন্তু শীত মানতে চায় না। যে পথ দিয়ে আমরা এগুচ্ছি এ-পথ আদতে ছিল মিউল-ট্র্যাক (mule-track)। ভারতীয় বাস্তুকারগণ সেই পথকে প্রশস্ততর করে জীপ চলবার উপযোগী করে তুলেছেন। এই রাস্তার দৌলতে নাথুলা গিরিবর্ত্ম অবধি যাওয়া চলে অবলীলাক্রমে। নাথুলার উচ্চতা ১৪২০০ ফুট। নাথুলা অবধি যে পথটি উঠে গেছে তা নানা কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় পাহাড়ী পথের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এত তির্যক বাঁক আর কোন পথেই নেই। মাথার উপরে গগনস্পর্শী পর্বতচূড়া। পর্বতগাত্র-বিলম্বিত বিশালকায় প্রস্তর খণ্ড প্রতি মুহূর্তে রীতিমত শঙ্কার উদ্রেক করছে। একপার্শ্বে অতল-গর্ভ খাদ। মাঝে মাঝে রজত-সলিলা উদ্দাম ঝোড়া রোদে ঝিক্‌মিক্ করছে, কোথাও মন্দগতি শান্ত রূপালী ধারায় পাহাড়ী ঝরণা খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট হ্রদ বা কুণ্ড—জলের রং মরকত-শ্যাম। পথের আগাগোড়াই এক দৃশ্য, কিন্তু একঘেয়ে না-লাগার কারণ সমগ্র দৃশ্যপটের বিরাটত্ব ও সীমাহীন ব্যাপ্তি। খানিকটা দূর থেকেই নাথুলার আভাস পাওয়া যায়। দূরে চোমোলহারী গিরিশৃঙ্গের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। চোমোল-হারী উচ্চতায় ২৩,৯৯৭ ফুট—অবস্থান তিব্বতে। সারা পথের

দু-পাশেই পাহাড়ের সানুদেশে ছোট ছোট পাহাড়ী বস্তী। গ্যাংটক হ'তে নাথুলা অবধি মোটর গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি। প্রধান-মন্ত্রী নেহরুজীই প্রথম এ-পথের উদ্বোধন করেন। জীপের শব্দে বস্তীর পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা দলে দলে রাস্তার পাশে এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। মুখে-চোখে তাদের ঘুমভাঙা বিস্ময়! অবাক হ'য়ে তাকিয়ে আছে ভিনদেশী মানুষগুলোর দিকে। একটা ছেলেকে ইশারায় ডাকলে গুটি গুটি কাছে এল, এবং হাত পেতে কেক-বিস্কুট নিল, তারপর ছুটে গেল নিজের সঙ্গীদের কাছে। আর নয়, এবার সরে পড়া যাক্, নচেৎ ঐ এক দঙ্গল ছেলেপিলে একবার পেয়ে বসলে আর নিস্তার নেই—সঙ্গের খাবার জিনিস সবই বিলিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ী এই মানুষগুলো বেজায় গরীব। পাহাড়ের গায়ে গায়ে জুম চাষ করে সামান্যই ফসল পায়। স্ত্রীপুরুষ সবাই মেহনতি মানুষ। গ্যাংটক নাথুলা রোড নির্মাণ কার্যে এরা বিশেষ-ভাবে সাহায্য করেছিল।

এখনও অনেকে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যে নিয়োজিত আছে। মেয়ে পুরুষ উভয়েই শক্ত সবল। মণটাক বোঝা অবলীলাক্রমে মাথায় চাপিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে চলতে থাকে। চড়াই-উতরাই ভেঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে চলাফেরা করার ফলে এদের পায়ের গোছা পুষ্ট ও সবল। যখন বোঝা নিয়ে উঁচুতে উঠতে থাকে তখন মুখে চোখে কেমন একটা নির্লিপ্ত ক্লান্তিহীন ভাব ফুটে ওঠে। এদের জীবন বড় একঘেয়ে বলেই মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট খোলার বস্তী—চাষ বাসের ক্ষেত্র অত্যন্ত অপরিসর, আর ঐ পাথুরে মাটি খুঁড়ে কতটুকুই বা জন্মাতে পারে! অন্নসংস্থান অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার, জীবন-সংগ্রাম ঐ রুক্ষ

কর্কশ পাথরের মতোই কঠোর। রাস্তায় যেতে যেতে দেখা যায় ভেড়ার লোমের মলিন ঘাঘরা পরা মেয়েদের—দু-চারটা পয়সা দিলে হাত পেতে নেবে—যদিও এরা ভিক্ষাজীবিনী নয়। কেরোসিন তৈল, মোমবাতি, সাবান, টর্চের ব্যাটারী আয়না চিরুণী আর সূঁচ-সুতো এদের ভারী প্রিয় বস্তু। বখশিশ দিয়ে অনেক শ্রমসাধ্য কাজ এদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়। শেরপাথাং-এ রাত্রিবাসের সময় রুটি সেঁকে দেওয়া, গরম জল ক'রে চা তৈরী ইত্যাদি কাজ একটি পাহাড়ী মেয়েই করে দিয়েছিল—বখ্শিশ দেওয়া হয়েছিল দুটি টাকা আর কয়েকটা দেশলাইয়ের বাক্স।

নাথুলা গিরিসঙ্কট অতিক্রম ক'রে প্রায় দুশো গজ নীচে নেমে গেলে তিব্বতের ভূমি স্পর্শ করা যায়। এখানে জীপ অচল। জীপের রাস্তা নাথুলা অবধি এসেই শেষ হ'ল। এখন থেকে বাহন হবে হয় পাহাড়ী টাট্টু ঘোড়া অথবা ভুটানের লোমশ গরু যাকে বলে ইয়াক (yak)। নাথুলা থেকে কার-গিউ মঠ হয়ে পথ গেছে ইয়াটুং অবধি। ইয়াটুং একটা নামকরা ভারত-তিব্বত সীমান্তের ব্যবসায় কেন্দ্র ও বন্দর। ভারত থেকে তিব্বতাভিমুখে যায় কাপাশ ও পশমি বস্ত্র, তৈল, লবণ, মনিহারি দ্রব্যাদি আর নানা যন্ত্রপাতি। আর ও-দিক থেকে আসে ভেড়ার লোম, কম্বল, কাঠ, দামী পাথর মাখন ও ডিম। ইয়াটুং প্রকৃত পক্ষে তিনটি রাজ্যের মিলনক্ষেত্র—ভারত, তিব্বত, ও ভুটান। ভুটানের সঙ্গে ভারত তথা জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চল এবং কালিম্পং-এর যোগাযোগ বহুদিনের। ভুটিয়ারা কম্বল, মাখন আর ডিম নিয়ে এ-সব অঞ্চলে বেচতে আসে। অনেক ভুটিয়া স্থায়ীভাবে ডুয়ার্স এবং আসাম অঞ্চলে বসবাসও করে। ইয়াটুং-এ একজন ভারতীয় বাণিজ্য-

প্রতিনিধি থাকেন। ইয়াটুং-এর বাজারে প্রতিদিন গলায় ঘণ্টা বাঁধা বহু খচ্চর বেসাতি বয়ে নিয়ে আসে ও চলে যায়

নাথুলা থেকে চেরিথাং। চেরিথাং ১২০০০ হাজার ফুট উঁচু। চার ঘণ্টার গো-যাত্রা। পাহাড়ের গা বেয়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক সঙ্কীর্ণ পথ। একদিকে পাথরের প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে,—আকাশ দেখা যায় না; আর অপর দিকে অতল খাদ। রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছল। টাট্টু-ঘোড়াও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। পা-পিছলে খাদে পড়ে গেছে এমন দুর্ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। ভুটানী গরু এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। ধীর শ্লথ গতিতে এরা উতরাই-এর পর উতরাই অতিক্রম করে যায়। সহজে পদস্খলন হয় না ব'লে এদের খ্যাতি আছে। তাই নাথুলার পর থেকে ইয়াক হল আমাদের বাহন। ইয়াটুং থেকে চেরিথাং যেতে পথে পড়ে যোচুর পুল। এটাই প্রকৃত পক্ষে তিব্বত-ভুটানের সীমান্ত রেখা। যোচু পুলের পর থেকেই শুরু হল ভুটানের মাটি। সঙ্গীদ্বয় শিওদাস ঘিমিরায় আর পদ্মপ্রধান ভুটানী ভাষাবিদ্। ইয়াটুং থেকে আরও দু'জন সঙ্গী জুটেছে। এরা ভুটানী, যাবে প্যারোজ্ অবধি। যদিও আমাদের দলীয় কেউ নয় তবু এরা বিপদসঙ্কুল পথের সাথী, কাজেই প্রকৃত বন্ধু। এদের ভাষা আমি বুঝি না। এরাও আমার কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু ঠারে-ঠোরে ভাব-বিনিময়ে কোন অসুবিধা হয় নি। যেমন নেপালীদের নামের শেষে বাহাদুর একটা প্রায়শ-প্রচলিত পদবী, তেমনি ভুটানীদের নামেরও একটা সাধারণ লেজুড় হচ্ছে দোর্জি। সে রাজা থেকে শুরু করে পাথর ভাঙ্গা কুলী সবার নামের শেষেই আছে ঐ দোর্জি শব্দটি। এর তাৎপর্য কি—এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর আজও পাই নি।

ইয়াটুং থেকে চেরিথাং প্রায় ৭ ঘণ্টার পথ। পথ একই রকমের তবে ইচ্ছা করলে এর খানিকটা—মাইল পাঁচেক—মোটরে যাওয়া যায়। সারা পথেই কুয়াশা আর বৃষ্টি। দৃষ্টি সামনে চলে না। ইয়াকের আগে আগে একজন ভুটানী পথ-প্রদর্শক লাগাম ধরে অতি সাবধানে সমগ্র দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশার অন্ধকার বিদীর্ণ করে মাঝে মাঝে পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির রূপ ফুটে ওঠে, যেন 'আলোর খড়্গ আঁধার মহিষে নিমেষে ফেলিল কাটিয়া।' পাহাড়ের পথে অগুণতি বাঁক, আর বাঁকগুলিই বেশী বিপদসঙ্কুল। দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু কানে আসে মৃদু টুংটাং বা গম্ভীর গল-ঘণ্টার আওয়াজ—বুঝতে হবে অপর দিক হ'তে হয় ভেড়া নয় ইয়াকের পাল আসছে। তখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অপর পক্ষকে পথ ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

পথ চলতে মানুষ বা মনুষ্যেতর জীবজন্তুর দেখা-সাক্ষাৎ ক্বচিৎ হয়, খুব বেশী নয়। পাহাড়গুলি কোথাও নিরাবরণ, রুক্ষ আবার কোথাও বা সবুজ গাছপালায় সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ী পথে যেখানে পাইন-দেওদার বনের সমারোহ সেখানে ফাঁকে ফাঁকে ছোট বড় বস্তী। রাস্তায় কাঠুরেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কোথাও ভেড়া বা ইয়াকের পাল তাড়িয়ে নিয়ে মানুষ চলেছে কোন দূর হাট-বাজারের উদ্দেশে। বুড়ো-বুড়ি, যুবা-যুবতী ছোট ছোট ভুটিয়া ছেলেমেয়েদের দেখা যায় বস্তীর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময়। একটা খুব খাড়া পাহাড়ের ধারে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গা পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা। নীচে অন্ধকার, তলহীন খাদ। এ-জায়গাটা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে রাখবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনলাম এক অদ্ভুত কাহিনী। পূর্বে চুরি রাহাজানি নারী-ধর্ষণ ইত্যাদি অসামাজিক

অপরাধের শাস্তি হত মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ডবিধান করত গ্রাম্য পঞ্চায়েত। হতভাগ্য দণ্ডিত ব্যক্তিকে হাত-পা শিকলে বেঁধে একটা উঁচু জায়গা থেকে নীচের অতল খাদে ফেলে দেওয়া হত। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পালিত হত এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে। সঙ্গী একজন বললেন যে, শেষ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা এই বিশেষ জায়গাটিতে পালিত হয়েছিল বছর ছয়েক পূর্বে। এক উদ্ভিন্নযৌবনা গ্রাম্য-কিশোরী পঞ্চায়েতের অনুশাসন লজ্ঘন করে কোন ভিন গাঁয়ের যুবকের প্রতি প্রণয়াসক্তা হয়েছিল—এই অপরাধে তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পাহাড়ের নীচে নিক্ষেপ করা হয়। কিশোরীটির প্রণয়ী যুবকও আড়ালে থেকে এই নিষ্ঠুর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে, এবং দণ্ড-পালনের অব্যবহিত পরেই কাউকে বাধা দেবার অবকাশ না দিয়ে সেই মৃত্যু-গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এইভাবে সমাজ-অসম্মত প্রেমের সকরুণ সমাধি রচিত হয়।

চেরিথাং-এর ডাক-বাংলাতে এক রাত কাটল।

রওনা হলাম চেরিথাং থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্যারো-জঙ্গ অভিমুখে। পথে পড়বে চু আলা ও হা-লা প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু গিরিপথ—দারজিলিং-এর উচ্চতার দ্বিগুণ। গা ঝিম ঝিম করে। মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্বে ফালুট ইউথ্ হোস্টেল পরিদর্শন করতে গিয়ে প্রায় ১৬ হাজার ফুট অধিরোহণ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম—কিন্তু এতটা অস্বস্তি অনুভব করিনি। আজ কেন এমন হ'ল? হয়তো বা গত দিন দশেকের নিরবচ্ছিন্ন পথ-চলার ধকল দেহের শিরা পেশী আর স্নায়ুগুলিকে নিস্তেজ করে ফেলেছে। মানুষের শরীরের সহন শক্তি যে নিতান্তই সীমিত।

প্যারোজঙ্গ ভুটানের এক বিখ্যাত স্থান। প্রধান দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান এখানকার মঠ। দুর্গম ও খাড়া একটা রুক্ষ পাহাড়ের চূড়ার উপরে পাথরের তৈরি এই মন্দিরটি। পাহাড়ের চূড়ায় অগম্য ঈগলের বাসার মতো দেখায়। মনে হয় কি ক'রে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ঐখানে যাওয়া সম্ভব? এ মঠ আবার দুর্গও বটে। জঙ্গ মানেই দুর্গ, উচ্চস্থান থেকে চারদিকেই সতর্ক নজর রাখা সম্ভব। মঠে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতি অল্প সময়ের নোটিশে মঠ ছেড়ে পালিয়ে যাবার গুপ্ত পথও রয়েছে। জন কয় লামা মঠের অধিবাসী। বিশিষ্ট আগন্তুক এলে প্রধান লামা স্বয়ং এগিয়ে এসে স্বাগত জানান। ব্রিটিশ আমলে বাংলার ছোটলাট বাহাদুর লর্ড রোনাল্ডশে সিকিম ভুটান অঞ্চল পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর লেখা বিবরণ "ল্যাণ্ড অব দি থাণ্ডারবোল্টস্" গ্রন্থে প্যারোজঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

ইয়াটুং থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শেষ হল প্যারোজঙ্গ এসে। পথে পড়ল চেরিথাং, হা-জঙ্গ ও তাঁফিয়ঙ্গ—তারপর পথ চলে গেল উত্তরমুখে ভুটানের রাজধানী পুনাখার দিকে। এর মধ্যেই শরীর সাময়িক অপটু হয়ে পড়েছে। পাহাড়ী কুয়াশা, বৃষ্টি আর কনকনে হাড়-কাঁপানো শীতে বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান বাঙালীর দেহটা বড়ই ক্লিষ্ট ও পীড়িত।

এখানেই এ-যাত্রা শেষ করতে হবে। বাঙালীর গৃহগত প্রাণ। ফিরে যাবার জন্য দেহ মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কি হবে আর এগিয়ে পুনাখার দিকে? এমনিতর নানা প্রশ্নের উদয় হ'ল মনে। আর শেষ পর্যন্ত ঘরের টানই প্রবল হ'ল। তাই স্থির হ'ল দিন কয় প্যারোজঙ্গের রেস্ট-হাউসে ক্লান্তি অপনোদন করে দেহটাকে একটু চাঙিয়ে তুলে ফিরতি মুখে রওনা হব।

ভুত ও ভয়ের দেশে

ইতিহাসের ক্ষীণ আলোকরেখায় এই পাহাড়ঘেরা অতি দুর্গম দেশটির অতীতকে ফুটিয়ে তোলা বড় শক্ত।

সত্যিকারের ইতিহাস শুরু হ'ল ১৯১০ সনে যেদিন ভারতের ব্রিটিশ সরকার ও ভুটান দরবার একটা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল। সেই সন্ধিই মেনে নিয়েছেন ভারতের জাতীয় সরকার ১৯৪৯ সনে। এর পূর্বেকার ইতিকথা সত্য ও কিংবদন্তী মিশ্রিত এক মনোজ্ঞ কাহিনী। পৃথিবীর বহু জাতিরই বিশ্বাস যে তাদের উদ্ভব দৈব। অনেক জাতিই তাদের উৎপত্তি নির্দেশ করে সূর্য, চন্দ্র, আকাশ নদী, পর্বত বা পশুরূপী কোন দেবদেবী হ'তে। ভুটিয়াদের ধারণাও অনুরূপ। দেশের মাটিতেই ঝঞ্ঝা ও বজ্রের সহমিলনে ভুটিয়া জাতির উৎপত্তি। ড্রাক্-পা বা বজ্র-মানুষ হচ্ছে ভুটিয়াদের আদি নাম। ভুটান বজ্রদানবের বিহারভূমি (Land of the Thunder dragon)। পর্বতের শিখরে-শিখরে বজ্রদানবের অবাধ বিচরণ। এর দুর্বার পদক্ষেপে হয় ভূমিকম্প, আর প্রবল নিঃশ্বাসে উঠে ঝড়। এর তুমুল তাণ্ডবে বিশ্বপ্রকৃতি হয় আলোড়িত। কিংবদন্তী আর সংস্কারের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে ঐতিহাসিক অনুমান।

কুচবিহারের আদিবাসী টেকু উপজাতি আর ভুটিয়ারা নাকি একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সতের শো সতের বা সেই সময়ের কাছাকাছি এক তিব্বতী বাহিনী ভুটিয়াদের দেশ জয় ক'রে নেয়। বিজেতা তিব্বতীরা বিপুল সংখ্যায় সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে

যায়। আর আদিবাসীদের সঙ্গে বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলে উৎপত্তি হয় ভুটিয়া জাতির।

এছাড়া আরও একটা থিওরী আছে। রণদুর্মদ চেঙ্গিস খাঁ'র এক বাহিনী হিমালয়ের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হ'য়ে অলঙ্ঘ্য পর্বত-প্রাচীরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল। উত্তর ও মধ্য ভুটানের উর্বরা সুফলা মাটির মোহ পরিত্যাগ ক'রে সেই সুদূর মঙ্গোলিয়ায় তাদের ফিরে যাওয়া হয়নি। চেঙ্গিস খাঁর বাহিনী থেকে গেল এখানেই। ভুটিয়ারা যে মঙ্গোলীয় সে-কথা নিঃসন্দেহ। তবে তিব্বতী সংমিশ্রণও রয়েছে প্রচুর। ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ, কোঁকড়ান বাবরি চুল আর রোগা লম্বা চেহারা মিশ্র উৎপত্তি নির্দেশ করে।

ভুটানের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় কুড়িজন নেপালী। এখন নেপালীদের আর নূতন করে বসবাস করবার অনুমতি দেওয়া হয়না। সিকিমের অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে-দিকে ভুটান সরকারের কড়া নজর। সিকিমে আজ নেপালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ক্ষমতাধিক্যে আদিবাসী সিকিমীরা কোণঠাসা। তাই ভুটানদরবার দেশের ভিতর বিদেশীকে সহজে ঢুকতে দিতে চায় না। এই নিয়ে পার্শ্ববর্তী ডুয়ার্স-অধিবাসী নেপালীদের মধ্যে ক্ষোভের অন্ত নেই।

খুব বেশী দিনের কথা নয় ভুটানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অনিশ্চিত ও অশান্ত। তিব্বতের মতো ভুটানেও যাজকরা পুরোহিত সম্প্রদায়ের ছিল নির্বিবাদ আধিপত্য। দালাইলামার অনুরূপ ধর্মরাজারও ছিল অপরিসীম প্রতাপ প্রতিপত্তি। দালাইলামার মতোই ধর্মরাজা পুনর্জন্ম পরিগ্রহ করতেন। এক সময়ে এক ধর্ম-

রাজার অকাল মৃত্যু ঘটে। নির্ধারিত চিহ্নবিশিষ্ট কোন উত্তরাধিকারীর সন্ধান না মেলায় ধর্মরাজার পদের বিলোপ ঘটে।

অতীতে ভুটিয়া দেশটি মোটামুটি চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসকেরা নিরন্তর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। তাদের দলবল আর অনুচরদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে থাকত বারোমাস।

দেশের নানাস্থানেই জং বা দুর্গ। এ-গুলির গঠন-পরিকল্পনা দেখলেই বুঝা যায় যে সব সময়েই দুর্গবাসীদের অবরোধ বা ত্বরিৎ নির্গমনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'ত। জং-এর ভিতর স্ত্রীলোক থাকা নিষিদ্ধ ছিল। গত শতকের শেষদিকে প্রাদেশিক শাসকচতুষ্টয়ের কোন একজন অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে এবং অপর তিনজনকে বশীভূত ক'রে নিজেকে সমগ্র ভুটানের দেবরাজ ব'লে ঘোষণা করে। সেই অবধি ভুটান কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়ে আছে।

দেশে আভ্যন্তরীণ লড়াই আর হয় না। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ভুটিয়ারা নিরুপদ্রব শান্তিতেই বসবাস করছে। বর্তমান রাজা হিজ হাইনেস জিগমি দোরজি ওয়াংচুক বয়সে তরুণ এবং প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন। তিনি এবং তার পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিতা সহধর্মিণী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে প্যারোর অতিথিশালায় স্বাগত সম্ভাবণ জানিয়েছিলেন।

রাজার নাম জিগমি দোরজি, আবার প্রধান মন্ত্রীর নামও জিগমি দোরজি। প্রধানমন্ত্রী মহারাণীর সহোদর ভ্রাতা। বর্তমান মহারাজা শিক্ষা, সমাজসংস্কার এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে উদারপন্থী। তিনি উন্নয়ন ও সংস্কারের পক্ষপাতী। তাঁরই চেষ্টায় আজ ভুটানের নানাস্থানে স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে। ভুটিয়া ছেলেমেয়েরা

ভুটিয়া ভাষা ও হিন্দি ছুই-ই পড়ে। কিছু ভুটিয়া ছেলেমেয়ে সরকারী অর্থানুকূল্যে ভারতের নানা স্কুলকলেজে নানা বিষয় অধ্যয়ন করছে। এরা ফিরে গিয়ে দেশের উন্নতিসাধন করবে।

ভুটানের কোন নির্ভরযোগ্য মানচিত্র এতদবধি ছিল না। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একদল কর্মী ভুটানরাজ্যে সার্ভের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ভারতসীমান্তে (ডুয়ার্স) থেকে ভুটানে যাবার কোন সড়ক নাই। পাহাড়ী পথ আর অরণ্যে পায়ে চলার পথ ছাড়া অন্য উপায় নাই। দেশের ভিতরেও এ-পর্যন্ত কোন সড়ক নির্মিত হয় নাই। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সড়ক নির্মাণের কথা ভুটান সরকার বিবেচনা করে দেখছেন।

অদূর ভবিষ্যতে পিচঢালা সড়কে মোটর চালিয়ে এই ছুর্গম ও একান্ত নিভৃত দেশে পরিভ্রমণ করাও হয়তো আর অসম্ভব থাকবে না।

ভুটিয়াদের স্বাস্থ্য এম্নিতে খারাপ নয়। তারা দরিদ্র কিন্তু ফসলাদি যা উৎপন্ন হয় তা তাদের পক্ষে অপ্রচুর নয়। দেশের মাটি উর্বরা তাই ফসল হয় বেশ ভাল। ভুটানের কোথাও ভিখারী দেখলাম না। ভিক্ষুক নেই-ও। কাপড়-বোনা ও বেতের কাজ, এবং রুপার বাসন প্রভৃতি হস্তশিল্প ভুটিয়াদের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল হলেও যৌন-ব্যাধির প্রাছুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। ভুটিয়ারা বেজায় নোংরা। জীবনে এরা স্নান বড় একটা করে না,এ বিষয়ে এরা প্রতিবেশী তিব্বতীদের দোসর। জামাকাপড় একবার গায়ে চাপালে না ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত আর পরিবর্তন করে না। ফলে সাধারণ ভুটিয়াদের গায়ের গন্ধে অনভ্যস্ত মানুষ কোন ছার, ভূত পালাবে। যৌন-ব্যাধি সিফিলিস নিবারণকল্পে মহারাজার আদেশে সব বয়স্ক

পুরুষ ও স্ত্রীলোককেই চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়। বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেছেন সরকার। যৌনব্যাধির ন্যায় বসন্তরোগ এবং গলগণ্ড (Goitre) রোগেও ভুটিয়ারা খুব ভোগে। বসন্ত প্রতিষেধকের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে আজকাল। প্রত্যেককেই বসন্তের টিকা নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

স্বভাবতঃ ভুটিয়ারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং জাতীয় ঐতিহ্যের অনুরাগী। আজ পঞ্চাশ বৎসর যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও শৃঙ্খলা তারা ভোগ ক'রে আসছে তার ফলে তাদের নিয়মানুগত্য ও রাজভক্তি অনেকটা বেড়েছে। একদিকে অলঙ্ঘনীয় পাহাড়ের বেষ্টনী, অন্যপক্ষে যুগান্তরের সংস্কারও সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল বিদীর্ণ করে বাইরের টুকরো আলো যেটুকু মাঝে মাঝে ভিতরে প্রবেশ করে তারই ফলে এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রভাবে সেই নিশ্চল, নিরুদ্বেগ জীবনেও আজ জাগরণের মৃদু স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। নেহরুজীর ঐতিহাসিক ভুটান পরিভ্রমণ এই জাগরণকে ত্বরান্বিত করে তুলবে —এমন আশা করা অন্যায় নয়।

ডুয়ার্সের রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশন থেকে দেড়শ মাইল দূরে ভুটানের নূতন রাজধানী থিম্পো। কথা চলছে এই দেড়শ মাইল পাকা সড়ক তৈরী করবার। এ সড়ক তৈরী হ'লে ভারতসীমান্ত থেকে ভুটান-রাজধানী যেতে মোটরে লাগবে বড় জোর দুইদিন। এখন এপথে চলবার বাহন একমাত্র ভুটিয়া গরু (yak) অথবা পাহাড়ী খচ্চর। রাজাভাতখাওয়ার দিকে থিম্পো থেকে এগিয়ে আসতে সিন্‌চালা ও প্যারো পথেই পড়ে। খচ্চরের পিঠে চেপে আসতে সময় লাগবে সাতদিন। পথে মাঝে মাঝে

রাত্রিবাসের স্থান পাওয়া যায়। সারা পথটাই চড়াই—বড্ড একঘেয়ে। উঠতে উঠতে ছহাজার-সাতহাজার ফিট উপরে উঠে গেলাম আবার তক্ষুনি শুরু হল উৎরাই।

পথের দৃশ্য অপূর্ব মনোরম। দীর্ঘ পাইন আর ফারের গহন অরণ্য প্রায়ই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন থাকে। উর্ধ্বে পত্র-পল্লব থেকে টুপটাপ জলের ফোঁটা অবিশ্রান্ত পড়ছে। সারা দেহ পুরু বর্ষাতিতে সুরক্ষিত, পায়ে ভারী মোজা তার উপর রবারের গাম-বুট। এসব সত্ত্বেও জেঁাকের উৎপাত থেকে রেহাই নেই। পায়ের মোজার ভিতর হয় শুকনো তামাকপাতা রেখে নয়তো মোজাজোড়া লবণ জলে ডুবিয়ে তারপর শুকিয়ে নিলে জেঁাকের উপদ্রব হ'তে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু বাহনগুলির অবস্থা অবর্ণনীয়। নাক নিয়ে কান দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। যন্ত্রণায় ইয়াকগুলির গলা দিয়ে একটা শব্দ বেরুচ্ছে গাক্ গাক্। ইয়াকগুলি চলে অনেকটা হেলে-দুলে। ইয়াকের পিঠের উপর কাষ্ঠাসন। তার উপর বসে দু'পা দু'পাশে ঝুলিয়ে দিতে হয়। টাট্টু ঘোড়া চড়ার চাইতে ইয়াক-আরোহণে আরাম অনেকখানি কম, কিন্তু নিরাপত্তা বেশী। ইয়াকের পিঠ চওড়া বেশী বলে অনভ্যস্ত আরোহীর পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইয়াকগুলি চলে অতি ধীরে, মন্থরগতিতে। পড়ে যাওয়ার ভয় কম। এই অদ্ভুত ও কষ্টসাধ্য ভ্রমণের একটা বড় সান্ত্বনা হচ্ছে সমুখে পিছনে ডাইনে বামে প্রাকৃতিক শোভার অফুরন্ত বৈচিত্র। বেলজিয়ম হল্যাণ্ডের গ্রাম প্রান্তরে দিগ্বলয় ব্যাপ্ত পাপিকুলের রক্তরাগ যেমন দর্শকের চিত্তহরণ করে ঠিক তেম্নি করে এই জনহীন অরণ্যভূমির অঞ্চল বিশেষে বন্য রডো-ডেনড্রন ফুলের অজস্র সমাবেশ। মনে হয় এ-যাত্রার বোধ·হয় আর

শেষ নাই। সেই চড়াই-উৎরাই, আর উৎরাই-চড়াই। শেষ নাই? সময়ও যেন আর এগুচ্ছে না। কালের অশান্ত চঞ্চল চরণক্ষেপ যেন কার ইঙ্গিতে থেমে গেছে।

এই দুর্গম জনহীন পথে মাঝে মাঝে জং (দুর্গ) ও বস্তী দেখা যায়। একদিন বিকালের দিকে একটা বস্তী পাওয়া গেল। ইয়াকগুলির আশু পরিচর্যা আবশ্যক। তাই থামতে হ'ল ও নামতে হ'ল। সঙ্গীরা নিয়ে গেল মোড়লের বাড়িতে। ছোটখাট একটা উৎসব চলছিল। নাচ ও বাজনা। ভৌতিক ও আধিদৈবিক কল্পনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ভুটানীরা এখনও সূক্ষ্ম, অনুভূতিসাপেক্ষ অধ্যাত্মিকতার সন্ধান পায় নি।

মুখোশ-নাচ যে-কোন উৎসবের প্রধান অঙ্গ। মুখোশ হচ্ছে নানা কাল্পনিক অপদেবতার প্রতীক। ঝড়, বজ্রপাত, দাবানল, ভূকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই আধিভৌতিক শক্তি বা দেবতা ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। এই আধিভৌতিক অকল্যাণকর শক্তিগুলির পরিতোষার্থেই মুখোশ-নৃত্যের আয়োজন। নাচের সঙ্গে বড় বড় পিতলের শিঙায় ফুঁ দিয়ে বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মুখোশ-নৃত্যের ভিতর দিয়ে যে ভাব-ভঙ্গী প্রকাশ পায় তা প্রধানতঃ ভীতিসঞ্জাত। মানুষের ঈশ্বর-চেতনা এবং ধর্মবোধ ভয় থেকেই প্রথম জাগরিত হয়েছিল। মানুষের মানসোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকতা ও সূক্ষ্ম উচ্চচিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ভুটিয়ারা তিব্বতীদের মত এখনও সেই প্রাথমিক স্তরেই রয়ে গিয়েছে। আদি ধর্ম যার নাম 'ফণ' আর তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম এ-দুয়ের সংমিশ্রণে ভুটানের প্রচলিত দুক্‌পা-খাজুপা বৌদ্ধমতের সৃষ্টি। প্যারোজং-এর

নিকটেই ২০০০ ফুট খাড়া পাহাড়ের গায়ে টাক্‌সাঙ্‌ গোম্ফা ভুটানের সব চাইতে বিস্ময়কর মঠ। এর সম্বন্ধে যে প্রচলিত কাহিনী তা আরও বিস্ময়কর—অবিশ্বাস্য। টাক্‌সাঙ্‌ কথার প্রতিশব্দ হচ্ছে বাঘের বাসা। না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন—একেবারে খাড়া পাহাড়ের গায়ে অতি সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটাবস্থায় এই গোম্ফাগুলির অবস্থিতি। যেতে হলে যে পথ দিয়ে গুটি গুটি উঠতে হয় তা একটা কাঠবিড়ালীর পক্ষেই যথেষ্ট। মানুষকেও সেই পথ দিয়েই যেতে হয়। 'বাঘের বাসা' নামটা সার্থক। টাক্‌সাঙ্‌ যাওয়া আর জ্যান্ত বাঘ ধরে আনা উভয়ই সমান বিপদসঙ্কুল। গোম্ফার ভিতরে গুরু পদ্মসম্ভবের অবতার গুরু ডোরজিথোলের নবভুজ মূর্তি। একটা উড়ন্ত ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠাসীন হয়ে অবতার এসেছিলেন এখানে, স্থাপন করেছিলেন টাক্‌সাঙের মঠ। গোম্ফার অভ্যন্তরে আছে আরও নানা দেবদেবীর বীভৎস মূর্তি আর একটা ভীতিপ্রদ ছমছমে নৈঃশব্দ্য। ফন পুরোহিতকে বলে পাউ। অনেকটা যাদুঘর, জ্যোতিষ ও ওঝার ত্র্যহস্পর্শ। অসুখ-বিসুখে, খেলাধূলা প্রতিযোগিতায়, বিদেশ-যাত্রায় এবং কোন নূতন কার্যারম্ভে পাউ-এর উপদেশ শিরোধার্য, ভবিষ্যদ্বানী অকাট সত্য।

ভুটানের সৈন্যসংখ্যা হাজার দশেক। তীর ধনুক আর গণ্ডারের চামড়ার ঢাল তাদের সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র। আজকাল ভারত থেকে আমদানী রাইফেল বন্দুকও সৈন্যদের দেওয়া হচ্ছে। তীর ধনুকের খেলা ভুটিয়াদের সব চাইতে প্রিয় জাতীয় খেলা।

রাজা, রাজপুত্র ও মন্ত্রী হ'তে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষ তীর চালনায় কমবেশী অভ্যস্ত।

তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতাকে ভুটানের জাতীয় খেলা বলা

যেতে পারে। রাজধানী থিম্বো সহরে প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে তুমুল হৈ চৈ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বর্তমান পৃথিবীতে যে কয়টি দেশ এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে মধ্যযুগীয় রহস্যের আবরণে ঢাকা পড়ে রয়েছে ভুটান তাদেরই অন্যতম। যান্ত্রিক সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ায় একটা এক ছাঁচে ঢালা জীবন-যাত্রা পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান প্রচলন দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলির স্পর্শপ্রভাব খুবই বিস্তার লাভ করছে। জেটপ্লেনের যুগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ আধা দুনিয়াটা ঘুরে আসতে পারে। সকালে প্যারীতে ব্রেক্‌ফাস্ট করে কাইরোতে লাঞ্চ খেয়ে রাত্রির আহার করাচীতে সামাধা করা আর তেমন কী তাজ্জবের কথা। একই রকম পোষাক, আর একই আহার এরোপ্লেন-ভ্রমণের দৌলতে আজ অনেকেরই বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। জাতিসংঘ বিশ্বরাজনীতি, সামাজিক অধিকার আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ঐক্য-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। এ অতি মহতি প্রচেষ্টা। এর সাফল্যে মানুষে মানুষে দ্বেষ-দ্বন্দ্বের হ্রাস ঘটবে এই আশাতেই আজকের হিংসাক্লিস্ট পৃথিবী বুক বেঁধে বসে আছে। মধ্যযুগের অন্ধকারে নিমজ্জিত ভুটানকে আজ সভ্যতার রাজপথে টেনে আনবার প্রয়োজন কী? বেশ আছে, থাক না একটা দেশ শান্ত নিরুদ্বেগ আরণ্যজীবনের আশ্রয়ে? তাতে জগতের ক্ষতি কি? বিশ্বমানবের জীবনে বৈচিত্র্যের মূল্য অনেকখানি। সেই বৈচিত্র্যকে বাহুল্য মনে করবার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই।

কিন্তু নিরেট পাহাড়ের আড়ালেও আজ নিরাপত্তা নেই! ভুটিয়ারা শৈলচূড়ায় তুষার ঝঞ্ঝার গর্জনে বজ্র-দানবের ফোঁস-ফোঁসানির শব্দ শুনতে পায়। শৈলচূড়া বিহারী দেব-দৈত্যের

শান্তি আজ বিঘ্নিত হচ্ছে এরোপ্লেনের হুঙ্কারে। আজ বিপদের আভাষ আসছে হিমালয়ের ওপার হ'তে। শঙ্কা ঘনিয়ে আসছে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে। আজ নেহাত নিরাপত্তার খাতিরেও আর রুদ্ধ দুয়ারে নিঃশঙ্ক অবস্থায় থাকা চলে না। বাইরের ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় কি? আজ সেই ডাক এসেছে—ভুটান সাড়া দিবে বৈকি?

বিস্মরণীয় আসাম

মনের খাতায় অহরহ চলেছে যোগ-বিয়োগের কাজ। বিগত-দিনের কথা ভাবলে দেখা যায় কতো জিনিসই না একদিন এসে ভিড় জমিয়েছিল এই খাতার পাতায়, কিন্তু আজ তারা অনেকেই হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির কোন অতলে। কিন্তু মানুষের মনের মালিক যিনি তিনি যে এক সুদক্ষ ডুবারি—স্মৃতির অতলে ডুব দিয়ে অনেক জিনিসই আবার তুলে আনেন। আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে স্মৃতি-রোমন্থন করতে গিয়ে তাই আশ্চর্য হচ্ছি আর ভাবছি সে সকল ভুলে-যাওয়া কথা, কত তুচ্ছ ঘটনা আর সে সব দিনের সেই মানুষগুলো যারা আজ মনের পর্দায় মিছিল সাজিয়ে চলেছে—তারা এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল!

এই সেই কদম্ব-নাগকেশর-কাঠগোলাপের কুঞ্জ। বহুদিন মানুষের হাতের যত্ন এরা পায়নি, কিন্তু তাই বলে অকৃপণা প্রকৃতির তিলমাত্র উপেক্ষা নেই এদের প্রতি। প্রকৃতির দানের প্রাচুর্য যেমন বৈচিত্র্যও তেমন।

কত বর্ষা-শরৎ-বসন্তের স্নিগ্ধ পরশ স্বাক্ষর রেখে গেছে এই অযত্ন-বর্ধিত কুসুম-নিকুঞ্জের পত্রে পত্রে পল্লবে পল্লবে। একদিন এই নিকুঞ্জের ছত্র-ছায়ায় ঘর বেঁধেছিল মানুষ! আর সেই মানুষের ঘরেই আবির্ভাব হয়েছিল এক অঘোষিত নবজাতকের। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। এ-মাটি সোনার বাড়া। মুঠি মুঠি সেই সোনার মাটি মাথায় তুলে দিলাম।

বামগাঁও চা-বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিমের যে অংশটা আজও পুরানো হাঁসপাতাল নামে পরিচিত, সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই বিশেষ স্থানটিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম যেন মনোবীনার ছিন্ন তন্ত্রীতে আবার মৃদু ঝঙ্কার উঠছে। এই সেই জন্মভূমি—যেখানে প্রথম নবপ্রভাতের আলোকে একটি অবোধ মানব-শিশুর চক্ষু দু'টি মুগ্ধ হয়ে ফুটে উঠেছিল! এই সেই পিতৃমাতৃপদধূলিপূত জন্ম-স্থান! প্রণাম তোমায় শতকোটিবার। হয়ত তোমায় আমায় এই শেষ দেখা!

সংসারের প্রবল আবর্তনে ক্ষুদ্র মানুষ স্রোতমুখে তৃণখণ্ডের মতই নিরুপায়। তোমায় আমায় আবার আদৌ দেখা হবে কিনা, তোমার স্নিগ্ধ ছায়া-সুবাস আবার ভাগ্যে জুটবে কিনা তার আশ্বাস কী! তাই আজ বিদায় দাও প্রসন্নচিত্তে হে আমার নিরুপমা জননী জন্মভূমি।

উনিশ শতকের আরম্ভকাল—ভারতে বৃটিশ শাসনের জমজমাট মধ্যলগ্ন। ভারতের পূর্ব প্রান্তিক শৈল-মেখলা আসাম পুরোপুরি বৃটিশ কুক্ষিগত। শিলংএ থাকেন চীফকমিশনার, আর জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিভূ প্রবল প্রতাপ-শালী আই-সি-এস্, আই-পি-এস্ অফিসারের দল। বৃটিশ

শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপে চারিদিকে নিবিড় নিশ্চল শান্তি বিরাজমান। বৃটিশ রাজের দাপটে আসামে বাঘে গরুতে যে এক ঘাটে জল খেত—এ কোন সৌখিন রূপক নয়—সত্যিকারের কথা।

কিন্তু আসামে প্যাক্স বৃটানিকার (Pax Britannica) প্রকৃত ধারক ও বাহক ছিল আর এক দল শ্বেতাঙ্গ যাঁরা সাধারণতঃ টি-প্ল্যাণ্টার্স নামে পরিচিত। আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চায়ের আবাদ বসিয়েছে সাতসাগরের ওপার থেকে আসা শ্বেতাঙ্গ বণিকদল। দুর্গম দুর্ভেদ্য বনজঙ্গল কেটে সাফ করে, পাহাড়ের বন্ধুর সানুদেশ চাষ করে,বাঘ-সাপের সঙ্গে লড়াই ক'রে দুঃসাহসী বিদেশী বণিকেরা চা-বাগান রচনা করেছে, আর চা রপ্তানী করে সারা দুনিয়ার চা পিপাসা মেটাচ্ছে। এই পরিশ্রম ও দুঃসাহসিকতার পারিতোষিক মিলছে কোটি কোটি টাকার মুনাফায়। চা-বাগানের সুবাদেই বিলেত থেকে আসছে সাহেব ম্যানেজার আর তার সহকারী। এরাই সাধারণভাবে টি-প্ল্যাণ্টার্স নামে অভিহিত। আর এরাই আসামের দুর্গম পর্বত ও অরণ্যের কোলে বসিয়েছে সাজান বাগান। চা-বাগানের ম্যানেজারের দাপট বুঝি বা সেই কুখ্যাত নীলকরের অত্যাচার-কাহিনীকেও ম্লান করে। সাহেবের বাংলোর সম্মুখ দিয়ে কেউ গাড়ি চড়ে যেতে পারবে না, কেউ ছাতি মাথায় দিয়ে চলতে পারবে না, সাহেব সামনে পড়লে তক্ষুনি সেলাম ঠুকতে হবে—এসব ছোট খাট নিষেধ-নিয়ম থেকেই সাহেবী রাজত্বের কঠোরতার আভাষ মিলে। এক-একটা চা-বাগান আয়তনে এমন দু-তিন হাজার একর জমি, হয়তো তারও বেশী। হাজার দুই কুলি, কেরাণী, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, মুহুরী

জমাদার, চা-বাবু এই আট-দশ জন বাবু শ্রেণীর কর্মচারী, সাহেব ম্যানেজার আর তার সাহেব সহকারী—এই নিয়ে চা-বাগানের জন সমষ্টি। সবার উপরে ম্যানেজার চা-বাগানের—হর্তাকর্তা বিধাতা প্রায়।

ইংরাজ শাসক হলেও জাতে বণিক। যেখানেই ইংরাজ গেছে সেখানেই ইংরাজ ব্যবসা ফেঁদেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অজুহাতেই ইংরাজের জগৎ-জোড়া উপনিবেশ। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব বিস্তারের গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে দেশের নানা প্রান্তে-উপান্তে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের শাসনতন্ত্র কায়েম করায় বিশেষভাবে সহায়তা করেছে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী। উনিশ শতকের মাঝামাঝি হতে বিশ শতকের প্রথম সিকি ভাগ অবধি দেশের নানা জায়গাতেই চাকুরির ক্ষেত্রে দেখা যেত বাঙালীর সংখ্যাধিক্য। বাঙালী ডাক্তার-কেরাণী-মাষ্টার-প্রফেসর প্রায়ই দেখা যেত দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলে। চাকুরি ছাড়াও বাঙালীর প্রাধান্য ছিল আইন ব্যবসায়ে। এই একটা কারণ অবশ্য ইতিহাস-স্বীকৃত। বাঙালীরা যে নিষ্ঠা ও যত্ন নিয়ে ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল, অন্যান্য প্রদেশবাসীরা প্রথমে ততটা করে নি। আসামের ক্ষেত্রেও এ-কথাটা খাটে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও আসামের সহরে সহরে বাঙালী হাকিম, উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার, কেরাণী বাবুদেরই ছিল একচেটিয়া আধিপত্য। চ-বাগানগুলিতেও প্রায় তাই। চা-বাগানের বাবু অর্থাৎ কেরাণী-ডাক্তার বেশীর ভাগই ছিল বাঙালী। কুলি চালান আসত সাঁওতাল পরগণা ও উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলি হতে। স্থানীয় আসামীরা

ঠিকা শ্রমিকের কাজ কর্ম করলেও বাগানের স্থায়ী কুলি হিসেবে নিযুক্ত হত না, বা তাদের নিযুক্ত করা হত না। তার কারণ আসামিরা সাধাসিধা সরল-প্রকৃতির মানুষ। স্বল্পে তুষ্ট। নিজের সামান্য জমি জমা দু'চারটা গরু-মহিষ নিয়ে সরল গ্রাম্য জীবনে অভ্যস্ত এই মানুষগুলি বাগানের কুলি বস্তির পরিবেশে একান্তই যেন বেমানান। আসামীরাও ধীরে ধীরে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করছিল। যারা অবশ্য দু'চারটে পাশ দিত তারা হত হাকিম, উকীল, প্রফেসর, ডাক্তার ইত্যাদি। আর যারা বেশীদূর এগুতে পারত না তাদের কেউ কেউ চ-বাগানের বাবু কর্মচারীর পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। বাগানে তিন শ্রেণীর মানুষ—সাহেব, বাবু আর কুলি। সাহেব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সাহেবের অনুগ্রহপুষ্ট বাবুর পদমর্যাদাও নেহাৎ কম নয়,—সূর্যতাপে তপ্ত বালির মতই অসহনীয়। বাবুদের সাহায্য ও সাকৃরেদি ছাড়া সাধ্য কি দু'জন সাহেবের পক্ষে এতগুলি মানুষের রাখালি করা। অসহায় আসলে কুলির দল। অজ্ঞ ও দরিদ্র এই মানুষগুলিকে চা-কর সাহেবরা প্রায় পশুর সামিল করে রেখেছে। শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে এদের আকৃতি প্রকৃতিও অত্যন্ত অনুন্নত। আত্মমর্যাদাহীন ও অজ্ঞান এই মানুষগুলির দৈহিক শ্রমের ভিত্তির উপরেই শ্বেতাঙ্গ চা-কর তৈরী করেছে তাদের বিরাট পুঁজিবাদী সম্পদ। চা-বাগানের এ-পাশে ও-পাশে দেখা যাবে লম্বা লম্বা চালা ঘরের সারি। এ-গুলি কুলি বস্তি। আদিবাসী, ভূমিজ, কাহার, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, উড়িয়া নানা জাতের মানুষের সমাবেশ এই সব বস্তিতে। এদের ভাষাও বিচিত্র, দিন গুজরানির রীতিনীতিও অদ্ভুত। পূর্ব জীবন ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে চিরদিনের মতো চা-

বাগানে সারা জীবনের জন্য দাসখত লিখে দিয়ে। স্ত্রীপুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ কেউই কুলিধরা আড়কাঠির হাত থেকে রেহাই পায় না। চা-বাগানের বস্তি জীবনের নূতন পরিবেশে এরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে যা হোক কোন প্রকারে। দাস-জীবনের শত হীনতা-দীনতার মাঝেও এরা আনন্দের অনুসন্ধান করে নাচ-গান হৈ-হুল্লোড়ে ও নানা পূজা পার্বনে। সপ্তাহান্তে প্রতি শনিবারে চা-কুলিদের দরমাহার (বেতন) দিন। যা দরমাহা পাবে তার বেশীটাই যাবে কাইয়া বাবুর (মাড়োয়ারী) দেনা শোধে আর কিছুটা যাবে লাউপানিতে (ভাত পচা মদ) বাকী যা থাকে তাতে হপ্তা চলা দুষ্কর।

কুলিদের দুঃখ আর ঘোচে না। সুদূর মাড়োয়ার থেকে এসেছে অর্থ-সন্ধানী কাইয়া বাবু। অতি নির্জন নিভৃত অঞ্চলেও কাইয়াদের গোলা। চা-কুলি, চা-বাগানের বাবু এমন কি চা-কর সাহেবদেরও এরাই মহাজন। হ্যাঁ, ব্যবসা এরাই করতে জানে। অর্থের এরা পোকা। অর্থ-লোভে এরা এমন কোন দুঃসাহসিক কাজ নেই যা না করতে পারে। আজ সারা ভারতবর্ষ দেশটাই মাড়োয়ারী-ভাটিয়া ব্যবসায়ীর অঙ্গুলি সঞ্চালনে উঠাবসা করছে। পুঁজিবাদের আজ অখণ্ড প্রতাপ। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকগণ পুঁজিবাদীর হাতের ক্রীড়নক। সাম্যবাদের গলাবাজি যতই করা হোক না কেন, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈষম্য দিন দিনই ভয়ঙ্কররূপে প্রকট হয়ে উঠেছে এদেশে, যার ফলে রাজনীতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ক্রমশঃই ধূমায়িত হয়ে উঠছে। সুদূর আসামের অতি নিভৃত অঞ্চলেও কাইয়া বাবুদের দেখা মিলবে। টাকার লেন দেন হয় কাইয়াদের মারফৎ। চাল-ডাল-তেল-নুন-মসলার কারবারের

সঙ্গে সঙ্গে এরা চড়া সুদে টকা খাটায়। কুলি-বাবু-সাহেব অনেকেই এদের দেনাদার। চায়ের কারবার এবং সামগ্রিকভাবে আসামের আর্থিক অবস্থার উপর এদের প্রভাব বড় কম নয়।

*　　　*　　　*　　　*

১৯০২ সন প্রায় ষাট বছর আগের কথা। আজকের আসাম আর সেই ষাট বছর পূর্বেকার আসাম এ-দুয়ের মাঝে অনেকখানি ব্যবধান। আজ আসামের নানা দিকে হয় পিচ-ঢালা নয় পাথর বাঁধান পথ। আগে ছিল বড়জোর কাঁচামাটির পথ নয় পায়ে হাঁটা বন পথ। চা-বাগানের মধ্যবর্তী পথগুলি অবশ্য বরাবরই ভাল। সাহেবরা কাঁচা মাটির রাস্তায় পোড়া কয়লার ঘেস ঢেলে মোটামুটি চলনসই করে নিয়েছিল তাদের বগি গাড়ি নয় হাল আমদানী হাওয়া গাড়ির (Motor car) জন্য। দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল জনবিরল ও জঙ্গলময়। সাপ খোপ বাঘ ভালুকের প্রাদুর্ভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের ভয়ে বাইরের মানুষ সহজে এই কুখ্যাত অঞ্চলে আসত না।

কুলি আমদানির মত চা-কর সাহেবরা বাইরে থেকে বাবু-সহকারীও আমদানী করতেন। বিশেষভাবে প্রয়োজন হত ডাক্তারি-জানা লোকের। পাশকরা যোগ্য চিকিৎসক পাওয়া ছিল খুবই দুষ্কর। এ-দিকে ম্যালেরিয়া জর্জরিত চা-বাগানের প্রত্যেকটিতেই একটি হাঁসপাতাল রাখা চাই। ডাক্তারের তাই একান্ত প্রয়োজন। সে সব দিনে চা-বাগানে অল্প স্বল্প ডাক্তারি জানা হাতুরে চিকিৎসকের সংখ্যাই ছিল বেশী, আর তাদের চিকিৎসা যত্নের উপরেই নির্ভর করতে হত ঐ-সব অঞ্চলে থাকতে গেলে। এঁদের বিদ্যা কম থাকলেও এঁরাই ছিলেন সত্যিকারের

পথিকৃৎ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বুদ্ধি আর প্রবৃত্তি নিয়ে এই সব দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে ডাক্তারি করা চলত না। বিদ্যার স্বল্পতা এঁরা পুষিয়ে দিতেন যত্ন ও আন্তরিকতার প্রাচুর্যে।

রাত নাই, দিন নাই, বৃষ্টি-বাদল নাই—প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে, বাঘ-সাপের ভয় তুচ্ছ করে এই সকল চিকিৎসকেরা আর্ত ও পীড়িত মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। তাই এঁদের উপর মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল অনেকখানি। একবার আমরা তিন ভাই ছুটির পর বাগান থেকে ফিরছি। বামগাঁও থেকে তেজপুর স্টিমার ঘাট ১৬।১৭ মাইল। কাঁচা মাটির সড়ক আগাগোড়া। একটা ঝরঝরে ট্রাকে ধূলিধূসর অবস্থায় সন্ধ্যাবেলা স্টিমার ঘাটে এসে দেখি গৌহাটি-আমিনগাঁওগামী জাহাজটা এইমাত্র ছেড়ে গেল। জাহাজ আবার পরদিন—২৪ ঘণ্টা পর। রাত্রিটা কাটাই কোথা? আমরা তিনজনেই বয়সে বালক। আমিই বড় —সবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। ছোট দু'জন স্কুলের ছাত্র। অনন্যোপায় হয়ে ঘাটের কাছেই একটি "পবিত্র" হোটেলে আশ্রয় নিতে গেলাম। হোটেল মালিক আশ্রয় দিলেন। কাঁচা মাটির ঘর—ইকড়ের বেড়ার মাটির প্রলেপে উপর চুনকাম করা। তারি একটা কামরায় আমাদের থাকার জায়গা নির্দিষ্ট হল। পাশের কামরা ম্যানেজারের। আমরা আমাদের সতরঞ্চি-চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি। পাশের ঘরে তখনও লোক-জনের কথাবার্তা চলেছে—বেশীর ভাগই অসমীয়া ভাষায়। শুয়ে আছি—পথশ্রমে ঘুমিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু কেন জানি ঘুম আসছে না। পাশের ঘরের কথাবার্তা একটু একটু কানে আসছে। একসময় মনে হল ঘরে কেউ নূতন আগন্তুক এল। কথাবার্তার

সুরও পাল্টে গেল। আগন্তুক গেয়েন্দা পুলিশের লোক। যে-সময়ের কথা বলছি—সেটা বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগ। দেশের সর্বত্র বাঙালী তরুণদের উপর পুলিশের কড়া নজর। তিনটি বাঙালী ছেলেকে হোটেলে আশ্রয় নিতে দেখে বা জেনে গোয়েন্দা পুলিশ খোঁজ খবর নিতে এসেছে। উৎকর্ণ হয়ে পাশের ঘরের আলাপ-সালাপ শুনছিলাম। আমাদের কথাই হচ্ছিল। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের পরিচয় দিচ্ছিল। হোটেলের খাতায় আমাদের নাম-ধাম পরিচয় সবই পূর্বে লিখিয়ে দিয়েছিলাম। বাবার নাম শুনে আগন্তুক পুলিশ-কর্মচারী মন্তব্য করলেন ঃ "এরা বামগাঁওয়ের ডাক্তার তারকবাবুর ছেলে, তাহ'লে সন্দেহের কিছু নাই ; তারকবাবু শিবতুল্য ব্যক্তি।" এই আসামী পুলিশ অফিসারটি কে তা জানতে পারি নি। কিন্তু এর মন্তব্যটি মনে গাঁথা হয়ে আছে।

শুধু একদিন এক জায়গায় নয়—একাধিকবার একাধিক স্থানে অপরিচিত লোকের মুখে বাবার সম্বন্ধে এরূপ উক্তি শুনেছি। বাগানের এবং আশে পাশের বস্তির অশিক্ষিত গরীব মানুষেরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বাবাকে দেউতা (বাবা) বলে ডাকত। বিপদে আপদে বন্ধুর মতো কাছে ছুটে আসত। বাবাকেও কোন দিন তাদের বিমুখ করতে দেখিনি। বহুদিন মধ্যরাত্রে বাবাকে দূর বস্তিতে রুগী দেখতে যেতে দেখেছি। সারা রাত গরীব রুগীর চিকিৎসা করে পরদিন ভোরে আবার যথানিয়মে বাগানের হাঁসপাতালের কাজে লেগে গিয়েছেন। সারাদিন নিজের চাকুরীর খাটুনি, আবার তারপর বাগানের বাইরের লোকের চিকিৎসা।

এই বাড়তি খাটুনির কোন পারিশ্রমিক ছিল না বল্লেই চলে। বস্তির মানুষ বেজায় গরীব। পয়সা দিয়ে ডাক্তার ডাকবে এ-অবস্থা তাদের নয়। কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ খেতের শাক সব্জি বা ফলমূল দু'চারটা উপহার নিয়ে আসত। মা তাই সানন্দে নিতেন, আবার দূরাগত পথ-ক্লান্ত উপহার দাতাকে পেট ভরে খাইয়েও দিতেন। অখ্যাত চা-বাগানের অল্প-বিত্ত ডাক্তার অজ্ঞ ও গরীব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদে ছিলেন অতুলনীয়। তাই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আসন লাভ করেছিলেন ভালবাসার। সাঁইত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে চাকুরীর পর বাবা যখন বামগাঁও ছেড়ে চলে আসবেন স্থির হল তখন যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল সচরাচর তার তুলনা মেলে না। যাত্রার প্রায় সপ্তাহ দু'য়েক পূর্বে কথাটা রাষ্ট্র হয়।

এই চৌদ্দ দিন নিকট ও দূরের বাগান ও বস্তির মানুষ প্রতিদিন অন্ততঃ একশো দেড়শো বাবাকে শেষ দেখা দেখতে আসত। সবাই আনত কিছু না কিছু উপহার। সে সব উপহার গ্রহণ ও ব্যবহার করার সময় আর হাতে ছিল না—তাই মা প্রায় সব কিছুই লাইনের কুলিদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

১৬।১৭ মাইল দূরবর্তী স্টিমারঘাট অবধি বাবাকে বিদায় দিবার জন্য মেয়ে-পুরুষ এসেছিল। ইতর জনগণের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন বাবা কেবলমাত্র তার নিঃস্বার্থ সেবা-ব্রতের পুরস্কারস্বরূপ।

াবড়ি আমাদের ঢাকা জিলার ভাওয়াল পরগণার একটা অখ্যাত গাঁয়ে। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারী পাশ করে বেরুবার পর ঠাকুরদা স্থির করলেন বাবাকে গাঁয়েই একটা ছোট-খাট

ডিস্‌পেনসারি খুলে বসিয়ে দিবেন। তাতে দুই কুল রক্ষা হবে। নিজ গাঁয়ে ও আশেপাশে দশ-বিশটা গাঁয়ে কোন পাশ করা ডাক্তার নেই। বরাত থাকলে পশার জমতে দেরী হবে না। আবার নিজ বাড়িতে থেকে পৈতৃক জমিজমা বিষয়-আশয় যা আছে তারও দেখাশুনা চলবে। বাড়ির বৈঠকখানার একপাশে একটা ছোট কামরায় গোটা দুইতিন কাঠের আলমারিতে ওষুধ-পত্র ও অন্যান্য ডাক্তারি সরঞ্জামাদি এল। একটা দিশি ঘোড়াও কেনা হল—দূর গাঁয়ে রুগী দেখতে যেতে হলে বাহন চাই। আয়োজনপর্ব প্রায় সারা হয়ে এল। এ-সব ঘটনার সময় আমার জন্ম হয় নি। এ-সব শোনা কথা—মায়ের মুখে। বাবা ও প্র্যাক্‌টিস শুরু করলেন। কিন্তু অদৃশ্য বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। ওষুধ-পত্র কেনা উপলক্ষে ঢাকা শহরে গিয়েছিলেন। পল্টনের মাঠে বিকেলে একটা বড় ফুটবল ম্যাচ খেলা হচ্ছিল। সেখানে দেখা এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে। কথায় কথায় বন্ধু বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "বলি, চাকরী করবি?" সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ বাবার আদৌ পছন্দ হচ্ছিল না। তখন বয়স কম—বৃহত্তর জগতের একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করছিলেন অন্তরে অন্তরে। উত্তর দিলেন, "পেলে করি বই কি?"

তারপর ওষুধ-পত্র কেনবার যে কয়টা টাকা ছিল তাই সম্বল করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। কে, কোথায় এবং কি সর্তে চাকরী দেবে—বন্ধু সে-সব কোন সমাচারই দেন নি। বন্ধু কেবল এই আশাটুকুই দিয়েছিলেন যে আসামে গেলেই চাকরী পাওয়া যায়, ডাক্তারের তো কথাই নেই। বন্ধুটি নিজে দরং জেলায় এ-অবস্থাটা প্রত্যক্ষ দেখে এসেছেন। তবে আর ভাবনা

কি? বাড়িতে ঠাকুর্দাকে একখানা পত্র দিয়ে একদিন আসাম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তখনকার দিনে আসাম অবধি রেলপথ তৈরি হয় নি। স্টিমারই ছিল প্রধান বাহন। ভারী ভারী ডেস্‌প্যাচ জাহাজে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে সুন্দরবনের পাশ কাটিয়ে মধুমতী-যমুনা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র নদীপথে আসাম যেতে হত।

গোয়ালন্দ এসে তেম্নি একখানা আসামগামী মালবাহী জাহাজ ধরলেন। স্টিমারেই কাটল দশদিন। এই দশদিন ডেকে শুয়ে বসে আর চিড়া-গুড় এবং খালাসীদের রান্না ভাত খেয়ে কাটাতে হল। কিন্তু লাভ হল একটা। জাহাজের ফার্স্ট ক্লাশ কেবিনের একমাত্র যাত্রী ছিলেন ভাগ্যক্রমে এক চা-কর সাহেব। বাবা গায়ে পড়েই সাহেবের সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে চাকরীর আবেদন জানিয়ে রাখলেন। সাহেব বাবার ডাক্তারি বিদ্যেটা পরখ করবার জন্যে কয়েকটা ওষুধের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাবার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে অক্টেভিয়াস স্টিল কোম্পানীর বামগাঁও চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবের কাছে একখানা সুপারিশ পত্র দিলেন। পরে এতেই কাজ হয়েছিল। তখনকার দিনে চা-বাগানের বাবুদের অনেকেরই চাকরী এ-ভাবেই হত। সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাবা নামলেন তেজপুর ঘাটে। সাহেবের গন্তব্যস্থল আরও উত্তরে কোকিলামুখ। স্টিমার যখন ঘাটে ভিড়ল তখন সন্ধ্যা-রাত্রি।

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। চেনা-জানা কেউ নেই। এমন কি কারুর ভাষা অবধি বুঝতে পারেন না। ছোট একটা টিনের বাক্স আর সতরঞ্চি জড়ানো বালিস বিছানা নিয়ে স্টিমার থেকে নামলেন।

এই রাত্রিতে কোথায় খাওয়া, কোথায় থাকা, কি করা ইত্যাদি আকাশ পাতাল চিন্তা মাথায় এসে জুটেছে। জাহাজঘাটের ফ্ল্যাটের এক পাশে বসে ভাবছেন।

আরও বিপদ—না কারুর কথা নিজে বোঝেন, না নিজের কথা কাউকে বোঝাতে পারেন। স্টিমার ঘাটের মালবাবু বাঙালী—তাঁরই অনুগ্রহে সে রাতের মতো আশ্রয় মিলল তাঁর বাসায়। পরদিন রওনা হলেন বামগাঁও অভিমুখে। তেজপুর থেকে একটা কাঁচা সড়ক বালিপাড়া হয়ে লকড়া ও চারদুয়ার অবধি চলে গিয়েছে। বামগাঁও সতের মাইল। এই কাঁচা পথে সতের মাইল গো-গাড়িতে যেতে একটা রাত পুরোপুরি লাগে। চায়ের বাক্স বোঝাই ত্রিপল ঢাকা গোগাড়ির ক্যারাভ্যান এই পথে চলে। বামগাঁও ফিরতি একটা গাড়ির সন্ধান মিলল সহজেই। গাড়োয়ানকে বক্‌শিস কবুল করে একরাত গো-গাড়ি ভ্রমণের পর বামগাঁও-এ এসে পৌঁছালেন।

শুরু হল জীবনের এক নূতন অধ্যায়। সেই যে বামগাঁও বাগানের ডাক্তারের পদে বাহাল হলেন--দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বৎসর সেই পদেই প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেলেন। তখনকার দিনে পাশকরা ডাক্তার সে সব তল্লাটে খুব কমই ছিল। আশেপাশের চা-বাগানগুলিতে এমনকি জেলা সদর বা মহকুমার সরকারী হাঁসপাতালগুলিতেও পাশকরা ডাক্তারের অভাব ছিল না। বহুবার বহুভাবে বেশী বেতনের চাকুরীর প্রলোভন এসেছিল তাঁর কাছে; একবার কিছুদিনের জন্যে সদিয়া ডিব্রুগড় অঞ্চলে লাহোয়াল বাগানে চলেও গিয়েছিলেন, কিন্তু মাস সাতেকের বেশী সেখানে থাকতে পারেন নি। নগণ্য বামগাঁও চা বাগিচাতেই কর্মজীবন শুরু এবং শেষ করেন। বামগাঁওয়ের প্রধান আকর্ষণ ছিল

সেখানকার মানুষগুলি। বিশেষ করে দুই ব্যক্তি নিশিবাবু আর মনোমোহন বাবু। দু'জনেই অসমীয়া। কিন্তু প্রথম দিন থেকে এঁদের সঙ্গে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় জীবনের নানা সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, লাভলোকসান সব কিছু ছাপিয়ে সে বন্ধুত্ব অটুট থাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। একদিনের জন্যও এই তিনজনের মধ্যে কোন অসদ্ভাব, অবনিবনা ঘটে নি। এবং বহুবার বহু লোভনীয় চাকুরীর প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বন্ধুত্বের আকর্ষণে।

সৎ, সজ্জন এবং সামাজিক ব্যক্তিরূপে তিনজনই এতদঞ্চলে সুপরিচিত ছিলেন। তখন তিনজনেরই বয়স ছিল কম। হাসিতে খুশিতে ও প্রাণের প্রাচুর্যে এদের দিনগুলি ছিল সমুজ্জ্বল। তিন জনই পরিশ্রমী, সরল ও সহজ প্রকৃতির মানুষ। জীবনে বিলাস ব্যসনের বালাই বড় একটা ছিল না।

কর্মক্ষেত্র তিনজনের পৃথক। বাবা ডাক্তার, নিশিবাবু একাউনটেণ্ট-ক্লার্ক বা চা-বাগানের বড়বাবু, আর মনোমোহনবাবু মৌজাদার। কিন্তু মিলনক্ষেত্র ছিল তাস·দাবা এবং গানের সান্ধ্য-আসরে। প্রতি সন্ধ্যায় আসর বসত কোন না কোন বাসায় এবং প্রায়ই সাইকেলে গ্যাস লাইট লাগিয়ে বাবা আর নিশিবাবু বেরিয়ে পড়তেন পাশের বা দূরের কোন বাগানের উদ্দেশ্যে। সেদিনকার সান্ধ্য আড্ডা জমত সেখানেই। বুড়াগাঁও, ফুলবাড়ি, আদাবাড়ি, ছাঁচড়া, ঠাকুরবাড়ি, বড়জুলি, সোনাজুলি, তারাজুলি ইত্যাদি ৮।১০টা বাগান নিয়ে একটা নৈমিত্তিক পরিক্রমা গড়ে তুলেছিলেন। নির্দোষ হাসি, গল্প, ঠাট্টা, খেলাধূলা, গানবাজনায় এঁরা দিনান্তের অবসর যাপন করতেন।

আমরা দু'ভাই যখন খুব ছোট তখন থেকেই এই রেওয়াজের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। নিশিবাবু আর বাবা প্রায়ই বাড়ি ফিরে আসতেন রাত ১১টা-১২টায়। শীতের রাতে মা আমাদের দু'ভাইকে খাইয়েদাইয়ে লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে একা একা সেলাই নিয়ে বসতেন। বাবা ফিরে এলে তাঁকে খেতে দিয়ে পরে নিজে খেতেন। বাবার এই প্রায় নিত্য নৈশপরিভ্রমণ নিয়ে মাকে একদিনও অভিযোগ করতে শুনিনি। অপর দিকে যে সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় নৈশ মজলিশটি বসত—এবং তা মাসে কমপক্ষে ৬।৭ দিন—সেদিন মায়ের কাজের আর অন্ত থাকত না। বৈঠকখানা ঘরে গানের জলসা বা তাসের আসর বসেছে, আর ঘন ঘন চা এবং খাবারের তাগিদ আসছে। মা একা চা ও নানা খাবার তৈরী করতেন এবং প্লেট সাজিয়ে চাকরের হাতে দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। এক একদিন আড্ডায় দশ-বারো কি তারও বেশী বাবুরা আসতেন, আড্ডা চলত রাত ১০।১১টা অবধি। এই ভাবে গড়ে উঠেছিল চা-বাগানের আসামী-বাঙালী বাবুদের একটি চমৎকার বন্ধু-সমাজ। সে-সব দিনে প্রাদেশিকতা ছিল না বল্লেই চলে। আসামের বঙাল-খেদা আন্দোলন তখন অভাবিত। সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াত। পরস্পরের প্রতি মমতা ও দরদের ভিত্তিতে একটি নাতিবৃহৎ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। আর এই অমায়িক গোষ্ঠীর কেন্দ্রমণি ছিলেন নিশিবাবু আর বাবা। এঁদের বন্ধুত্ব তেজপুর অঞ্চলে একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। অসমীয়া আর প্রবাসী বাঙালীর হৃদ্যতার মূলে কুঠারাঘাত করে বৃটিশের কূট ভেদনীতি। বিদেশী পাদ্রী সম্প্রদায় ছিল এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী। বাঙলা ও অসমীয়া হরফ প্রায় একই। ভাষাগত পার্থক্যও

অতি সামান্য। কিন্তু কূটকৌশলী পাদ্রী সম্প্রদায় হরপ আর ভাষাগত পার্থক্যের ক্ষীণ সূত্রটি ধরেই ধীরে ধীরে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষের বিষ সঞ্চারিত করেছিল। তারপর এল বৃটিশ শাসনের আর এক চাল—সরকারী চাকুরীর প্রলোভন। সরকারী চাকুরী ও অন্য প্রকারের অনুগ্রহ-বণ্টনের লোভ দেখিয়ে বৃটিশ কূট-নীতি ভারতের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে রেষারেষি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, উত্তরকালে তারই অনিবার্য পরিণাম—ভারত বিভাগ। অসমীয়া-বাঙালী বিদ্বেষের গোড়াতেও সেই ভেদনীতির সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

"আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই, আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;

মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি—মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি।"

কথাটা একটু ঘুরিয়ে দেখলে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়।

*　　　*　　　*

দরং জেলার সদর শহর তেজপুর আর এক নাম শোণিতপুর। প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে মাথায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে নিখুঁত ছবির মত ছোট্ট শহরখানি। স্টীমার-ঘাট থেকে সোজা ঢালু পাথুরে রাস্তা ধরে শহরের দিকে এগিয়ে যেতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে পথের দুধারে প্রকাণ্ড পদ্মবিল। মানুষের হাতের তৈরি নয়, প্রকৃতির দান—বিস্তীর্ণ কমল সরোবর। সারা বিল ভরে ফুটে রয়েছে অজস্র পদ্মফুল, কাকচক্ষু-নীল গভীর জলে ভাসছে বড় বড় পদ্মপাতা। পাখিই বা কত! মানুষ এখানে

পাখির প্রতিপক্ষ নয়। পক্ষিকূল নিরুপদ্রব শান্তি উপভোগ করে এই জলাশয়ের আশ্রয়ে। তাই এদের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে অবাধ ও অবিরত। জলকেলিমত্ত আর ক্রীড়াশীল উড়ন্ত পাখির কলরবে এ রম্যভূমি সারাদিন মুখর থাকে। বলাকার প্রসারিত পাখায় সূর্যালোকপাতে কী অপরূপ বর্ণালীর সৃষ্টি হয়!

পাখিও নানা জাতের। সারস, শামুক্‌খোল, করোমণ্ট, বক, মাছরাঙ্গা, বালিহাঁস আরও কত কী! তেজপুরের প্রবেশ-পথেই পদ্মবনের এই মনোরম দৃশ্য আর পাখির কলধ্বনি পথিকের নয়নে ও মনে এনে দেয় আনন্দের আবেশ। রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে সহরের মাঝখানে। তুই পাশে সমতল ভূমির ফাঁকে-ফাঁকে নাতি-উচ্চ টিলা, আর তারই মাথায় ছোট বড় সুন্দর সুন্দর বাংলো। বাংলোগুলোয় লাল, সবুজ ঢেউতোলা টিনের চাল আর চুনকাম করা মাটির প্রলেপ-দেওয়া ইকরের বেড়া। দরজা জানালা কাঠের ফ্রেম বসানো। পাহাড় অঞ্চলে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়ে থাকে, তাই অপেক্ষাকৃত হাল্কা উপাদানে ঘর বাড়ী তৈয়ারী করাই শ্রেয়। তাছাড়া সব দেশেই মানুষ সহজলভ্য স্থানীয় মাল মশল্লা দিয়েই ঘর বাড়ি নির্মাণ করে থাকে। আসামে বাঁশ আর ইকর প্রচুর জন্মায়—তাই বাঁশ, ইকর আর মাটি দিয়েই এ-দেশের ঘর-বাড়ি অধিকাংশ নির্মিত হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলেও পাকা বাড়ি খুব বেশী নেই। তেজপুরে তো খুবই কম।

প্রচুর বৃষ্টিপাত আর মাটির স্বাভাবিক উর্বরতার ফলে এ-অঞ্চলে গাছপালার অফুরন্ত প্রাচুর্য। পাহাড়ের গায়ে গায়ে, সমতল ভূমিতে অজস্র বনজ ফুল ফুটে থাকে। প্রকৃতির এই সহজ শোভা বুঝি মানুষের মনের পটেও রঙীন তুলির আলপনা এঁকে দেয়।

ধনী-নির্ধন বড়-ছোট প্রায় প্রতি মানুষের গৃহের সামনে ও আশে-পাশেই পাতাবাহার, ফেনা, স্থলপদ্ম, বেলফুল, গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুলের বাগান দেখা যায়।

এখন হতে তিরিশ বছর আগেকার কথা বলছি। সে সময়ে এই সহরটির যে সুন্দর পরিপাটি রূপটি মনের পটে আঁকা হয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনটি আর কোথাও বড় চোখে পড়ল না।

তেজপুর প্রাচীন স্থান। এর সঙ্গে এক প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর যোগ আছে। শ্রীকৃষ্ণপুত্র অনিরুদ্ধ আর বানরাজ-দুহিতা ঊষার প্রণয়-কাহিনী। অনিরুদ্ধ ঊষাকে অপহরণ করে বিবাহ করেন। তেজপুর সেই বানরাজার রাজধানী—এখনও একটা অরণ্যাকীর্ণ পাহাড়ে অতি প্রাচীন পাষাণ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বানরাজার গড় বলে নির্দিষ্ট হয়।

তেজপুর থেকে উত্তর দিকে বালিপাড়া, চারদুয়ার, লোকড়া সীমান্ত অভিমুখে একটা ছোট্ট লাইট রেলওয়ে লাইন চলে গিয়েছে মাইল কুড়ি—আমারিবাড়ি স্টেশন অবধি। লাইনটা গেছে কতকগুলি চা-বাগানের ভিতর দিয়ে। পথে পড়ে ছেঁচা, ঠাকুরবাড়ি, রাঙ্গাপাড়া, হাতিবাড়ি প্রভৃতি কয়েকটা বাগান। চা-বাগানের স্বার্থেই এই রেলপথের সৃষ্টি। তখনকার দিনে পাকা পিচঢালা সড়ক হয় নি। কাঁচা রাস্তায় গোগাড়িতে পরিভ্রমণ অপেক্ষা লাইট রেলওয়ে যে সহস্রগুণে শ্রেয় সেকথা বলাই বাহুল্য। তেজপুর থেকে বামগাঁও তখনকার দিনে আমরা এই ছোট্ট দেশলাইয়ের বাক্সের মত গাড়িতেই যেতাম। আর কী ভালই না লাগত এই গাড়ি-চড়া। চড়াই-উৎরাই বেয়ে শ্যামশোভা চা-বাগানের ভিতর দিয়ে হুস হুস শব্দে ধীর মন্থর গতি গাড়িটা এগিয়ে যেত। কুড়ি

মাইল পথ—সময় লাগত পাঁচ কি ছয় ঘণ্টা। তা লাগুক। সে যুগটা ছিল ধীর গতির যুগ। আজকের দিনের মত এত তাড়াহুড়োর বালাই তখন ছিল না। খোলা গাড়ি দু'পাশ থেকে হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গায়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিত। আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বসে গাড়ির নিরবচ্ছিন্ন ঝাকুনি অনুভব করতাম। যাতে আদৌ আনন্দ না পাওয়ার কথা তাতেই পেতাম প্রচুর আনন্দ। আনন্দ যে মনের একটা বিশেষ অবস্থা। আজকের পরিণত বয়সের মন ও বুদ্ধি দিয়ে সে দিনের বেহিসেবী আনন্দের যাচাই করা চলবে না।

আমারিবাড়ি এই লাইনের শেষ ষ্টেশন। এখানে নেমে হয় হেঁটে নয় গরুর গাড়িতে আরও মাইল পাঁচেক পুবে গেলে বামগাঁও। বামগাঁও পৌঁছুবার আগেই পথটার একটা শাখা উত্তরমুখে বুড়াগাঁও বাগান হয়ে চলে গিয়েছে লোকড়া। লোকড়ায় আছে সৈন্য-শিবির। লোকড়া ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চারদুয়ার সীমান্ত ঘাঁটি। পথের শেষ এখানেও নয়—আরও উত্তরে দুর্গম পার্বত্য পথ চলে গিয়েছে তোয়াং ও লংজু অবধি। এ-পথেই শরণার্থী দালাই লামা চীনাদের তাড়ায় দেশ ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

চারদুয়ারের পথে একবার আমরা সদলবলে চড়ুই ভাতি করতে বেরিয়েছিলাম। বাবা, নিশিবাবু এবং আরও দশবারোজন বাবু সাইকেলে এগিয়ে গেলেন। মনোমোহনবাবুর এক পা খোঁড়া তিনি গেলেন তাঁর টাট্টু ঘোড়ায় টানা হালকা বগি গাড়িতে। মা ও অন্যান্য মহিলারা আর আমরা যারা ছোট তাদের বাহক হল গরু আর মোষের গাড়ি গোটা ছয় সাত। খুব ভোরেই চা

পানের পর এই নাতিবৃহৎ ক্যারাভানটির যাত্রা শুরু হল। পথে ছোট ছোট পাহাড়ি নদী পার হতে হল গোটা তিনেক। নদী গুলির একদিকে ঢালু পাড়। গাড়িগুলি নিচের দিকে নামার সময় হড়বড় থড়বড় শব্দে দ্রুত গড়িয়ে যেতে গাগল। মা গরু-মোষের গাড়িতে চড়তে বেশ একটু ভয় পেতেন। তিনি ও অন্যান্য মহিলারা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন আর আমরা আমোদে চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। বেশ একটা হৈচৈ হট্টগোলের মধ্যে ছোট ছোট পার্বত্য নদীগুলি পার হওয়া গেল। কিন্তু গাড়ি এসে থামল ভরলী নদীর কলধা ঘাটে। ভরলী খরস্রোতা নদী—স্রোত ও গভীরতা উপেক্ষা করবার নয়। আমাদের পূর্বগামী দল আগেই এসে পৌঁছে গেছেন। সাইকেল, বগি গাড়ি ও গরু-মোষের গাড়িগুলি এ-পাড়ে গাঁও-বুড়া ডেকারামের জিম্মায় রেখে ডিঙ্গি চেপে আমাদের যেতে হবে ও-পারে। তারপর সেখান থেকে আবার গো-গাড়ি বাহনে পৌঁছুতে হবে গন্তব্যস্থান ভালুকপোং। গোটা গাছের গুঁড়িটা খোদাই করে ডিঙ্গি তৈরি করা হয়েছে। ডিঙ্গিগুলি এতো সঙ্কীর্ণ যে একজনের পাশে আর একজন বসতে পারে না। আর বসতে হবে খুব সন্তর্পণে—নড়াচড়া চলবে না। একটু নড়াচড়া করলেই ডিঙ্গি টলমল করবে।

ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য বাঁশের বাখারি দিয়ে দুটো ডিঙ্গিকে পাশাপাশি বেঁধে নেওয়া হয়। তাতে সুবিধা এই যে নৌকা হেলেদোলে কম। পাহাড়ি নদীর তলদেশ উপলময়। জল স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মত। দশ বারো হাত নীচের পাথর স্পষ্ট দেখা যায়। আর দেখা যায় নানা আকারের ও বর্ণের মাছ। এ নদীতে লগি চলবে না। বৈঠাই একমাত্র সম্বল। মিরি মাঝিরা বৈঠা

মেরে মেরে নৌকাগুলিকে স্রোতের বিপরীতে নিয়ে যেতে লাগল। নদীর মাঝে মাঝে বিপজ্জনক আবর্ত—এ দেশের মাঝিরা বলে 'ঘাগরি'। নীচের উপলখণ্ডে জলস্রোত প্রতিহত হয়ে উদ্দাম আক্রোশে শত তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ। বহুদূর থেকেই ঘাগরির গর্জন শোনা গেল।

ঘাগরিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় উপায় নেই। নদীর এ-পাড় ও-পাড় জুড়ে সে এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ। খুব সতর্কতার সঙ্গে নৌকা না চললে সলিল-সমাধি প্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা। মা গঙ্গার নাম স্মরণ করে, ইষ্ট দেবতার নাম জপতে জপতে বাঙালী আরোহীরা ঘাগরি অতিক্রম করল। অবাঙালী যাঁরা এই দলে ছিলেন তাঁরাও বাঙালীদের অনুকরণ করলেন অর্থাৎ নাম জপ করতে লাগলেন। মানে মানে নৌকাগুলি ঘাগরি পেরিয়ে গেল। মিরি মাঝিরা বেশ পোক্ত।

যখন ভালুকপোং এসে পৌঁছুলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা।

স্থানীয় গাঁও-বুড়া আগে থেকেই বাঁশ ও ইকরের ছাউনি তৈরি করে রেখেছিল। এই ছাউনিগুলিই হ'ল বনভোজনকারিদের সাময়িক আস্তানা। ছায়াতে বসে সবাই বিশ্রাম করতে লাগল। ও দিকে কয়েকটা সারি সারি একচালা। মা এবং অন্যান্য মহিলারা রান্নার কাজে লেগে গেলেন। মৌজাদার মনোমোহনবাবু নদীতে ছিপ ফেলে গোটাকয়েক ভাল মাছ ধরেছিলেন। খিঁচুরি, মাছ ভাজা, মাছের ঝোল বেশ তাড়াতাড়িতে রান্না হয়ে গেল। সঙ্গে আনা দই, মিষ্টি ও চাটনি সহযোগে বন-ভোজন ব্যাপারটা বেশ ভালভাবেই সমাধা হ'ল। এ-দিকের পাট সাঙ্গ হতেই বেলা প্রায় গড়িয়ে এল।

সন্ধ্যার আগেই রওনা হতে হবে। পথে পড়বে নদী, বন-জঙ্গলের পথে রাত্রি বেলায় সমূহ বিপদ। ফিরবার পথে একটা জায়গা দিয়ে যখন গরুমোষের গাড়িগুলি যাচ্ছিল তখন বেশ একটা মজার ঘটনা ঘটল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পথের পাশেই একটা পাতাঝরা শুকনো গাছ। ডালে ডালে যেন কালো কালো বাদুড় ঝুলছে—দূর থেকে তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলে সেগুলো বাদুড় নয়। গাছের ডালে বেশ গোটাকয়েক ভালুক। মানুষ ও গাড়ির আওয়াজে যেন খানিকটা সন্ত্রস্থ হয়ে ভালুকগুলি দুপদাপ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বনের মধ্যে আত্মগোপন করল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। সামনের পথ ভাল দেখা যায় না। টিমটিমে হ্যারিকেনের আলোয় পথের রেখা দেখে গাড়োয়ানেরা গাড়ি চালাচ্ছে। ঠিক রাস্তার ধারেই শুকনো ডাল আর ঘাসের ধুনি জ্বালিয়ে একজন ডফ্‌লা জাতীয় লোক। লোকটা আগুনে একটা হরিতাল পাখি ঝলসাচ্ছে। পরে লবণ ও লঙ্কাসহযোগে অর্ধদগ্ধ পাখিটার সদ্ব্যবহার করবে। সাঁঝের অন্ধকারে ডুমডুমা পোকার উপদ্রব বেড়েছে। দেহের যে কোন অংশেই এই পোকা বসলে সেখানে ঘা হবে। ভারী বিষাক্ত পোকা। ডফলাটার গায়ে অসম্ভবরকম নোংরা একটা জামা। পায়ে পট্টি জড়ান। মাথায় একটা পাখির পালকের টুপি। পরনে নেংটি মাত্র।

লোকটার ভয়-ডর কিছুমাত্র আছে বলে মনে হয় না। এই নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল বনপথে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ বসে পক্ষী-মাংস ভক্ষণের উদ্যোগ করছে। তাকে আমাদের দলেরই কেউ জিজ্ঞাসা করল: এ জঙ্গলে বাঘের উৎপাত আছে কিনা। এর উত্তরে সে বলেছিল:

বাঘ থাকলেই বা কি ! তার কোন ভয় ডর নেই। বাঘ তার দেহের বিকট গন্ধে ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। এরা স্নান বড় একটা করে না। জামা কাপড় একবার গায়ে চাপালে ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর শরীর থেকে বদলায় না। গায়ের গন্ধ অতি বিকট। গো-গাড়ির ক্যারাভান গন্তব্য পথে ধীরে ধীরেএগিয়ে চলল। লোকটা কিন্তু আগুনে পাখিটাকে ঝলসাতে লাগল।

অদ্ভুত এই পাহাড়ী মানুষগুলো। অতি সরল ও সহজ কিন্তু অবস্থাবিশেষে নিরতিশয় ক্রূর ও হিংস্র। আসামে নানা উপ-জাতির বাস। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে অভিজাত অসমীয়া আর উপ-জাতীয় আবর, মিরি, মিশমি, কাছারি, ডফলা, আকাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ না থাকলেও, ব্যবহারিক জীবনে এরা পরস্পর হতে সম্পূর্ণ আলাদা। অসমীয়ারা শিক্ষা-দীক্ষায় এবং আর্থিক অবস্থায় অনেক উন্নত। আসামের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে অসমীয়াদেরই হাতে। অসমীয়ারা নিজেদের প্রাধান্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন। উপজাতীয়দের একটু ঘৃণামিশ্রিত অনুকম্পার চোখেই দেখে।

উপজাতীয়েরা বাস করে অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে। অসমীয়ারা থাকে শহরে এবং সমতলভূমিতে গ্রামাঞ্চলে। উপ-জাতীয়েরা এখনও বেশীর ভাগ এ্যানিমিষ্ট—ভুতপ্রেত, গাছপালা, নুড়িপাথর ইত্যাদির পূজা করে। একটা ডফলা গ্রামে একবার আগুন লেগেছিল। খড়ের চালার ঘরগুলি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে ! বীর যুবকবৃন্দ তীর, ধনুক, দা, কুড়াল ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে আগুনকে আক্রমণ করল। তাদের বিশ্বাস আগুন এক

দুষ্ট দৈত্য বিশেষ—হাতিয়ারের ঘায়েই সে টিট্ হবে? জল ঢেলে যে আগুন নেবান যায় সে ধারণাই তাদের নেই। কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় না! কিন্তু সত্য ঘটনা। এদের প্রাত্যহিক জীবনে সেই আদিম আরণ্য সরলতা। পাহাড়ের স্তরে স্তরে পাহাড়ী উপজাতীয় মানুষের বস্তি। উপরের মানুষ বেসাতি নিয়ে আসে নিচের স্তরে আবার নীচের স্তরের মানুষ নামে আরও নিচুতে। সমতলের বাসিন্দাদের সঙ্গে পাহাড়ের উপরের মানুষের সংস্রব বড় কম। প্রাচীন কালে জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে বেচাকেনা চলত। তখনও মুদ্রার প্রচলন হয় নি, অথবা হ'লেও শহর-বন্দরের বাইরে দূর পল্লী-অঞ্চলে পণ্যবিনিময় প্রথাই প্রচলিত ছিল। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে পণ্যবিনিময় প্রথার (barter) বহুল প্রচলন দেখা যেত। পাহাড়ের দুই স্তরের মাঝামাঝি কোন নির্দিষ্ট স্থানে বড় বড় পাথর সাজান থাকত। ঐগুলি হচ্ছে হাটের দোকান। উপরের মানুষ জিনিসপত্র এনে সেই পাথরের উপর সাজিয়ে রাখত। নীচের মানুষ তুল্য মূল্যের জিনিস সেখানে রেখে উপরের জিনিস নিয়ে আসত। অনেক সময় ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার আদৌ দেখা সাক্ষাৎ হত না। কিন্তু তাতে লেনদেনের কোন অসুবিধা হত না। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী জিনিসপত্রের নির্দিষ্ট মূল্যের খেলাপ কেউ করত না। সে-সব দিন আর সে-সব প্রথাকে আজকের মানুষ আমরা অচল বলে পরিহাস করি। কিন্তু সে-দিনে না ছিল কালোবাজার না ছিল মুনাফাবাজি। মানুষের মন ছিল অনেক সৎ, অনেক নির্মল। এ-সব উপজাতীয় মানুষের অতিথি-বাৎসল্যের খ্যাতি বড় কম ছিল না। অভ্যাগত ও অতিথির প্রতি এদের আদর যত্ন ছিল সমধিক। অতিথির পরিচর্যায় ও

মনোরঞ্জনে বাড়ির যুবতী মেয়ে বা বধূর নিয়োগ আদৌ দূষনীয় বলে গণ্য হত না। অতিথিকে পরিতৃপ্ত না করে গৃহস্বামী ও গৃহিণী আহার করবে না। অতিথির থাকবার জন্য গৃহের শ্রেষ্ঠ স্থানটি নির্দিষ্ট করা হবে। অতিথিকে সত্যই দেবতা জ্ঞান করা হত।

আবার নৃশংসতাও এদের কম নয়। অত্যন্ত রগচটা মানুষ। ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট। অতি সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করে খুনোখুনি হয়। একটা ভোজালি বা দা প্রত্যেকেরই নিত্যসঙ্গী, আর যে কোন মুহূর্তে সেটা অপরের ঘাড় দ্বিখণ্ডিত করতে পারে। মনোমোহনবাবুর মুখে শোনা একটা নির্মমতার কাহিনী বলি। তাঁরই এক পূর্বপুরুষ ছিলেন মৌজাদার। একবার একদল আকা তার বাড়ীতে এসেছিল খাজনা দিতে। নিয়ম মাফিক অতিথি সৎকারে কিছু বিভ্রাট ঘটেছিল। তাতে রুষ্ট হয়েছিল। আকা -দলপতি। আকারা মৌজাদারের একজন অধস্তন কর্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। মৌজাদারের কাছে দাবী করল যে সেই কর্মচারীটিকে উপযুক্ত শাস্তির জন্য তাদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। মৌজাদার তাতে সম্মত না হওয়ায় আকারা ভবিষ্যৎ প্রতিশোধের ভয় দেখিয়ে চলে গেল। তার বেশ কিছুদিন পরে সেই অভিযুক্ত কর্মচারীটি খাজনার তাগাদায় আকা-অঞ্চলে যায়। আকারা সেই পূর্ব অপমানের কথা ভুলে যায় নি। এই সুযোগে হতভাগ্য কর্মচারীটিকে আহরণ করে পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে নিয়ে যায়। হাত-পা বেধে তাকে পাথরের উপর ফেলে জবাই করার মত তার সারা দেহ ধারাল কাটারির সাহায্যে পোঁচ দিয়ে দিয়ে কাটে, আর সেই কাটা ঘায়ে লবণ ও জংলী লেবুর রস লাগিয়ে অসহ্য

যন্ত্রণা দিয়ে লোকটাকে হত্যা করে। তখনও ইংরাজ-শাসন এ সকল অঞ্চলে কায়েম হয় নি। তখনও জঙ্গলের আইন ছিল বলবৎ।

*　　　*　　　*

মানুষের প্রতিবেশী বাঘ

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরি মাথায় নাচি।

আসামবাসীর পক্ষে এ-কথাটা আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে খুবই সত্য ছিল। কলধাঘাট হ'য়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে সেদিন অনেক রাত হয়েছিল। এ-দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। শীতও ক্রমশঃ বাড়তে শুরু করল। জঙ্গলের রাস্তায় গোটাকয়েক টিম্‌টিমে হ্যারিকেন লণ্ঠনের সাহায্যে মোষের গাড়িগুলির অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ হচ্ছেনা। জঙ্গলের চারদিকেই একটা কেমন অস্বস্তিকর থম্‌থমে ভাব। মাঝে মাঝে বন্য-পাখির ডানার ঝটপটানি ছাড়া আর কোন আওয়াজ বড় একটা কানে আসছিল না। তবে মোষের গাড়িগুলির চাকার একটা একটানা গোঙানির শব্দ সারাক্ষণই হচ্ছিল। হঠাৎ একটা গাড়ির মোষ আচমকা ভয় পেয়ে বিগড়ে গেল। গাড়িসুদ্ধ গিয়ে ঢুকল পাশের ঘাসবনে। হু-হু-হু-হু শব্দ ক'রে গাড়োয়ান অনেক চেষ্টা করল মোষ দুটোকে বাগ মানাতে, কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। গাড়ি হুড়মুড় শব্দে

অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। বিপদের কথা। অন্য গাড়ির চালকেরা হৈ হৈ ক'রে সেই পলাতক গাড়ির পিছনে ছুটে চলল। আমরা অন্ধকারে পথের মাঝেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তাই কি বিপদ কম! চালকহীন গাড়ির বাহনগুলি যদি একদিকে রোখ ক'রে ছুটে যায়, তাদের এখন রুখবে কে?

মহিলারা ও ছোটরা চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিল। ও-দিকে সাইকেল-আরোহীর দল অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন গাড়িগুলির অপেক্ষায়। গাড়ির বিলম্ব দেখে ওঁরা পিছনে ফিরে এলেন ব্যাপার কি দেখবার জন্য। ততক্ষণে সেই পালিয়ে-যাওয়া মোষ ও গাড়িটাকে উদ্ধার করা হয়েছে। গাড়ির আরোহিরা অক্ষত দেহেই ফিরে এসেছেন। আবার যাত্রা শুরু হ'ল। ভরলী নদী পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল দুটো।

দূর বনপ্রান্তে বা পাহাড়ী নদীর চরে এ-জাতীয় বনভোজন বছরে দুটো-একটা ফি বৎসরই হ'ত। কিন্তু এ-যাত্রার বনভোজনের অভিজ্ঞতা নানা কারণেই অবিস্মরণীয় হ'য়ে রয়েছে।

* * *

আমাদের বাসায় বছরের প্রায় সকল সময়েই অতিথি লেগে থাকত। নানা বিচিত্র চরিত্র ও অভিজ্ঞতার মানুষ আসত। কেউ কেউ আসত ভাগ্যান্বেষণে অর্থাৎ চাকরি-বাকরির খোঁজে, কেউ বা ক্যানভাসার, কেউ বা আর কিছু। এদের বেশীর ভাগই বঙ্গবাসী অথবা শ্রীহট্টী। এ-তল্লাটে বাবার অতিথি-বাৎসল্য প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল। আগন্তুকেরা অন্যত্র যেখানেই যান না কেন একবার বামগাঁও-এর ডাক্তারবাবুর বাসায় পদার্পণ করবেনই। কেউ বা ক্ষণিকের অতিথি দু-তিন-চারদিন থেকেই চলে যেতেন। কিন্তু

অনেকে একবার এলে প্রায় মৌরুসীপাট্টা গেড়ে বসতেন—তিন-চার-পাঁচ মাস অবধি থেকে যেতেন। অনেকে আবার দু-এক মাস পর ঘুরে ঘুরে আসতেন। আবার দু-একজন ছিলেন যাঁরা ফি বৎসর একটা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দিতেন। এমনিতর একজন ছিলেন রোহিণীবাবু (রোহিণী মজুমদার), যশোহর অঞ্চলের লোক। প্রতিবৎসর শীতকালে গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি নিয়ে আসতেন। বিক্রি-টিক্রি মন্দ হ'ত না। একটা গরুরগাড়ি মাসিক হারে ভাড়া নিতেন, তারপর কাপড়ের বাণ্ডিল গাড়িতে চাপিয়ে এ-বাগান সে-বাগান, এ-বস্তী সে-বস্তী ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। প্রতিবারই একবার আমাদের বাসায় আসতেন এবং দু-এক হপ্তা থাকতেন। ফলে আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় আত্মীয়তার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল। আমরা কাকা বলে ডাকতাম। একযাত্রা রোহিণীবাবু পাঁচ-ছয় দিন আমাদের বাসায় থেকে রওনা হ'লেন চারদুয়ারের দিকে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা দুটা নাগাদ গাড়ি চেপে বসলেন। হিসেবমত মাইল সাত-আট পথ যেতে ঘণ্টা চারেক লাগবার কথা, অর্থাৎ সন্ধ্যা সাতটার আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবেন। হিসেব ঠিকই ছিল। কিন্তু গোল বাধল পথ-নির্ণয়ে। গাড়োয়ান নূতন। প্রায় অর্ধপথ যাওয়ার পর রাস্তাটা দুইদিকে ভাগ হ'য়ে গিয়েছে। একটা গেছে চারদুয়ারের দিকে, আর অপরটা গেছে আকা পাহাড়ের দিকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে। গাড়োয়ানের ভুলে গাড়ি বেঠিক পথে ক্রমশঃ অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করতে লাগল। এ-দিকে বেলা যায় যায় সন্দেহে রোহিণীবাবু গাড়ির মুখ ঘোরাতে বললেন। কিন্তু গাড়ির মুখ ফেরাবার আগেই এক বিষম কাণ্ড ঘটল। তখনও সন্ধ্যা হয়নি, কিন্তু বনপথে এরি মধ্যে

অন্ধকার নেমেছে। হঠাৎ গাড়ির গতি রুদ্ধ হ'ল। বলদ দু'টো ফোঁস ফোঁস ক'রে গাড়ির জোয়াল থেকে মুক্ত হবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে। গাড়োয়ান ও রোহিণীবাবু সভয়ে সামনে তাকিয়ে দেখলেন যে সংকীর্ণ পথের ঠিক মাঝখানে বসে আছে এক বিপুলকায় বাঘ। সম্মুখের পা দু'টার উপর ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে বসে আছে এক রক্তলোলুপ হিংস্রতার প্রতিমূর্তি, দীর্ঘ লেজটা একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে সশব্দে আছড়াচ্ছে। দড়ির বাঁধন ছিঁড়তে না পেরে বলদ দু'টা মুহূর্তে একেবারে অ্যাবাউটটার্ণ ক'রে ছুট দিল, কিন্তু পালিয়ে যাবার উপায় নেই। বাঘটাও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ঠিক আবার গাড়ির সামনে হাজির। বলদ দুটো আবার ঘুরল, বাঘও আবার পথ আগলিয়ে সামনে এসে বসল। এ-ঠিক যেন ইঁদুর বিড়ালের খেলা। বাঘটা যেন মুখের শিকার নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছে। এ খেলা যে কতক্ষণ চলেছিল তার হিসেব রাখবার মত রোহিণীবাবুর তখন মনের অবস্থা ছিল না। গাড়োয়ানটা এরি মধ্যে গাড়ির উপরেই অচেতন হ'য়ে পড়েছে। তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ বেরুচ্ছেঃ বাঘ বাঘ। এই বিষম বিপদেও কিন্তু রোহিণীবাবুর বুদ্ধি বা চেতনা লুপ্ত হয়নি। তাই রক্ষা। বিপদে যে ব্যক্তি মাথা ঠিক রাখতে পারে সে-ই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। রোহিণীবাবু সাহস হারাননি। তাঁর সঙ্গের বাক্সে ছিল একবোতল মেথিলেটেড স্পিরিট। ভ্রাম্যমান জীবনে প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসই সঙ্গে রাখতে হয়। বাণ্ডিল থেকে একখানা কাপড় বের ক'রে তাতে স্পিরিট ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে অগ্নি সংযোগ ক'রে বাঘটার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেই বাঘটা ভয় পেয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে

পড়ল। রোহিণীবাবু গাড়ি থেকে নেমে অনেক কষ্টে বলদ-দু'টোকে সংযত করে গাড়ির মুখ ফিরিয়ে উল্টোদিকে রওনা হ'লেন। মাইল কয়েক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পর যখন প্রথম এক বস্তীর কাছে এসে পৌঁছুলেন তখন রোহিণীবাবুর অবস্থা অবর্ণনীয়। শঙ্কা, উত্তেজনা আর পরিশ্রমে তিনি তখন প্রায় হতচেতন। বস্তীর মানুষের পরিচর্যায় একটু সুস্থ হলে পর রোহিণীবাবু সব ঘটনা তাদের বললেন। গাড়োয়ানও ততক্ষণে চেতনা ফিরে পেয়েছে। বস্তীর লোকেরা বলল যে ওই বাঘটা একটা বুড়ো বাঘ। বাঘ বুড়ো হ'লে আর ততটা ছুটতে পারে না। হরিণ বা অন্য বন্য জন্তু শিকার করতে না পেরে তখন অনন্যোপায় হয়ে লোকালয়ের আশে পাশে ছাগলটা, কুকুরটা, গরুটার লোভে ঘোরাফেরা শুরু করে—অনেক সময় অবস্থা-গতিকে মানুষকেও আক্রমণ করে, আর একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে মানুষখেকো হয়ে দাঁড়ায়। এই বাঘটাও মানুষ মেরেছে। এ-অঞ্চলের মানুষের কাছে এ বাঘটা একটা বিষম ত্রাসের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তারা রোহিণীবাবুকে বলল: আপনার বাপ-মায়ের ভাগ্যি আপনি এ-যাত্রা বেঁচে গেলেন। সে রাত্রি সেই বস্তীতে কাটিয়ে পরদিন রোহিণীবাবু বুড়াগাঁও চলে যান। এ-গল্প রোহিণীবাবুর নিজের মুখে শোনা।

* * *

আসামের অধিষ্ঠাত্রী কামাখ্যা দেবীর বরে আসামে বাঘে-সাপে মানুষ খায় না এম্নিতর প্রচলিত বিশ্বাস। নান্‌সাই মোষের গাড়ির চালক—যেমন জবরদস্ত জোয়ান তেম্নি দুর্জয় সাহসী। কাঠ কাটতে গেছে ভরলী নদীর তীরে অনতিগভীর জঙ্গলে। বেশীরভাগ ইকড় ও উলখাগরার ঝোপ, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা ও ছোট বড় ডুমুর,

বুনো পেয়ারা, শিমূল ও বাবলার গাছ। একটা মাঝারি গোছের শিমূলগাছ বেছে নিয়ে গাছের গোড়ায় কোপ বসাতে গিয়ে নান্‌সাই দেখল যে কোপ বসাতে গেলে একটা নির্দোষ ঘুমন্ত প্রাণীকে আঘাত করা হবে। একটা চিতাবাঘ শুয়ে ঘুমুচ্ছে যে। মানুষে-বাঘে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। নান্‌সাই সরল বিশ্বাসে বাঘটার গায়ে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল "উঠ উঠ, চলা যা, হামি তুর কোন গুহ্‌ণা নাই করে।" আর যায় কোথা, একটা বিকট হুঙ্কারে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল নান্‌সাইয়ের উপর। নান্‌সাইও ছাড়বার পাত্র নয়, হাতের কুঠারখানার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেনি। বাঘটা ঘায়েল হ'ল বটে কিন্তু নান্‌সাই-কে শেষ ক'রে দিয়ে গেল। বেচারার অর্ধমৃত যে দেহটা সঙ্গীরা নিয়ে এল তা দেখে নান্‌সাই ব'লে চেনবার উপায় ছিল না।

আর একবার ঘটেছিল এক অদ্ভুত ঘটনা। এই বনেই বাগানের বড় সাহেব জন্‌স্টন এসেছেন সদলবলে বাঘ শিকারে। তাঁর সঙ্গে গোটা দুই হাতি আর মানুষ জনকয়েক। তাদেরই একজন বংখী ফান্দী (বংশী ফান্দীর অসমীয়া সংস্করণ)। ফান্দীর অর্থ যে ফাঁদ পেতে হাতি ধরে। সারাদিন টো-টো করে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেও কোন শিকারের সন্ধান মেলেনি। ক্ষুণ্ণ মনে সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আস্তানার দিকে ফিরছিল। সন্ধ্যা হয় হয়। একটা হাতি আগে এগিয়ে গেছে। পিছনের হাতিতে স্বয়ং জন্‌স্টন সাহেব আর তাঁর দুই সঙ্গী। হাওদার পিছন দিকে বংখী ফান্দী। জায়গায় জায়গায় খুব উঁচু হাতি-ঘাস (Elephant grass)। হাতির পিঠ প্রায় ডুবে যায়। হঠাৎ পিছনদিকে একটা আচম্‌কা গর্জন। জন্‌স্টন সাহেব দেখলেন এক বিরাট বাঘ লাফ দিয়ে হাতির পিঠে উঠে বংখীকে

কোমরে কামড় দিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। হাতিটা অনেকটা আনাড়ি। বাঘের গর্জন ও পিঠে বাঘের নখের আঁচড়ে ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করেছে। অনেক কষ্টে হাতিকে ফিরিয়ে আবার যখন ঘটনাস্থলে আনা হ'ল তখন অন্ধকারে সবদিক ছেয়ে গেছে, কিছুই চোখে দেখা যায় না। চিৎকার হৈ চৈ খুবই হ'তে লাগল অবশ্য। হঠাৎ মনে হ'ল বেশ খানিকটা দূরে যেন একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল। তারপর সব চুপচাপ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বংখীকে পাওয়া গেল বাঘের মুখে মৃতপ্রায় অচেতন অবস্থায়, কিন্তু আশ্চর্য বাঘটাও মরেছে। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল তা এই ঃ

বংখীকে বাঘ যখন মুখে ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বংখীর হাত ছুটো ছিল মুক্ত আর তার কোমরে বাঁধা ছিল গুলিভরা মশার পিস্তল। অত বিপদেও বংখী সাহস হারায়নি। এক হাতে পিস্তল বের ক'রে বাঘের ঠিক গলায় ফায়ার করে। বাঘের তাতেই ইহ-লীলা শেষ হয়। বংখী অজ্ঞান হ'য়ে মরা বাঘটার কাছেই পড়েছিল।

ঘটনাটা গল্পের মতো শোনালেও সত্যি।

বংখী ফান্দীর জীবন-কথাও বিচিত্র। দূর পাহাড়ের গায়ে এক ছোট পাহাড়ী বস্তীর মানুষ। অতি শৈশবকাল হ'তেই অরণ্য-জীবনের কঠোরতায় অভ্যস্ত। অতি ছোট কালে গাঁয়ের রাস্তায় ধূলাবালি নিয়ে খেলা করছিল একদিন। অন্যের অলক্ষ্যে এক জংলী ডফ্‌লা পিঠে তুলে নিয়ে যায় দুর্গম পাহাড় চূড়ায় নিজের আস্তানায়। মানুষ-শিকারী বা head-hunter ব'লে ডফ্‌লাদের এককালে কুখ্যাতি ছিল। কিন্তু যে কারণেই হউক এই চুরি-করা ছেলেটিকে তারা প্রাণে মারেনি। হিংস্র-প্রকৃতি ডফ্‌লাদের সংস্রবে

থেকে বংশীও বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। পরে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ে এক হাতিধরার দলে এবং সেখান থেকেই শুরু হয় নূতন জীবনধারা। হাতিধরা হিসাবে বংশীর খুব নামডাক। বামাগাঁওয়ের ম্যানেজার ওয়াইলস্ সাহেবের ছিল হাতি-ধরার সখ। বংশী তার মাইনে-করা কর্মচারী। তা-ছাড়া আসামের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বংশীর ডাক আসত। তাতে রোজগার হ'ত বেশ ভালই। সংসারে একমাত্র সম্বল একটি মেয়ে। স্ত্রী যেদিন মারা যায় সেদিন তার খেদায় যাবার কথা, আগে থেকেই বায়না নেওয়া হয়েছে। মুমূর্ষু স্ত্রীকে চাং-ঘরে রেখে মেয়েকে নিচে নামতে বারণ করে রাতে বেরিয়ে গেল। ছোট মেয়ে ভয়ে সারারাত কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে পড়েছিল। পাশেই কখন তার মা মারা গিয়েছে জানতেও পারেনি। চাং-এর নিচে গভীর রাতে বাঘ এসেছিল—তার গোঙানির শব্দে একবার মেয়ের ঘুম ভেঙেছিল। বংশী তখন দূর পাহাড়ে বুনো হাতি ধরার কাজে ব্যস্ত। এম্নি এদের জীবন—বন্য, দুঃসাহসিক!

কত বিচিত্র মানুষ

নানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষ নিয়েই ছিল চা-বাগানের সমাজ। এদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, ভালবাসা-কলহ সব কিছুরই পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ। কিন্তু এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। এক অদ্ভুত-চরিত্রের স্ত্রীলোক ছিল দুখ্‌নী (দুঃখিনী)। কোন আড়কাঠির বেড়াজালে আটকে প'ড়ে শেষটায় চা-বাগানের কুলী লাইনে এসে হাজির হয়। আমরা যে-সময়ে তাকে দেখি তখন সে বিগতযৌবনা। বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা

করলে এক নিঃশ্বাসে বলে যেত ঃ বাপের বাড়ি হাটরামপুর, শ্বশুর-বাড়ি সোনামুখী, আর স্বামীর নাম দুর্গা রায় ঘাটোয়াল। স্বামীর নাম মুখে এনেই আবার লজ্জায় সিকি-হাত জিভ বার করত। যতবার বলত ততবারই করত। বাগানের কুলী-লাইনে যার সঙ্গে ঘর পেতেছিল তার নাম ভেউয়া। ভেউয়া তার দ্বিতীয় স্বামী। লাউপানি (ভাত-পচা মদ) খেয়ে উদ্দাম নাচে-গানে দুঃখ্ণী ছিল অদ্বিতীয়া। সারা বাগানে তার জুড়ি ছিল না। পর পর তিন-চার রাত সমানে নেচেছে, কিন্তু পরদিন নিয়মিত কাজে বেরিয়েছে অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে। ভেউয়ার হাতে বিষম প্রহার খেত যখন-তখন। এ-ব্যাটা ছিল যেমন পাঁড় গাঁজাখোর তেম্নি বদরাগী।

দুখ্ণীর বয়স যে কত হয়েছিল তা বলা মুস্কিল। তার স্বভাবে ছিল যৌবনের দুরন্তপনা। মাথায় একমণ ওজনের বোঝা নিয়ে অবলীলাক্রমে সাত মাইল রাস্তার চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে দুই ছিলিম তামাক খেয়ে ঘণ্টা চার-পাঁচ অবলীলাক্রমে নেচে যাবে উদ্দাম তালে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান ঃ

> লেঠে বাপ্তি এখে জাতি
> ফিরে গোঠে মাঠে।
> কাঁধে জালি মাছ ধরে
> দরিয়ার মাঝে।—

এ গানের শব্দগত কোন অর্থ নাই বা থাকল। এ-যে স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরের আনন্দ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুখ্ণীর মত আরও বহু বিচিত্র মানুষের সন্ধান মিলত চা-বাগানের কুলি-লাইনে। নানা জাত, নানা ধর্মবিশ্বাস, নানা ভাষা ও নানা আচার-বিচারের সে যেন এক অপূর্ব শ্রীক্ষেত্র। চা-কুলীর

জীবনধারা একঘেয়ে, কিন্তু তার মধ্যেও থাকত বিচিত্র বর্ণালীর আভাস।

রাতের আঁধার না কাটতেই কলঘরের তীক্ষ্ণ বাঁশী প্রভাতের আগমনবার্তা ঘোষণা করত। আমরা তখনো উষ্ণ শয্যার আশ্রয়ে সুখসুপ্ত। বাবা সবার আগে উঠতেন, এবং তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মা। বাবা হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে হাসপাতালে চলে যেতেন পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে নানা কাজ, রোগীর জন্য গরম জল, প্রাতরাশ, হাসপাতালের ঝাঁটপাট সব কিছু নিজে দাঁড়িয়ে নিখুঁতভাবে করিয়ে নিতেন। তারপর অন্য প্রাথমিক কর্তব্যাদি সম্পন্ন ক'রে চা-খাবার খেতে বাসায় আসতেন সাড়ে ছটায়। একদিনের জন্যেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে দেখিনি। এর মধ্যে আমাদেরও ঘুম ভাঙত। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করতাম কখন বাসার পাশে বিরাট রায়ডাঙ্গ গাছ থেকে পাখির ঝাঁকের উড়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাব। আর শুনতে পাব কুলী-লাইনে ঝুমুক চৌকিদারের উচ্চকণ্ঠ হাঁক: "বস্তীবালা জাগ, উঠ"।

রায়ডাঙ্গ গাছটা ছিল অন্ততঃ হাজার পাখির বাসস্থান। পাখিগুলি পাহাড়ী শালিখ। প্রতিদিন ভোরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা ঝাঁ-আ-আ-আক্ শব্দ ক'রে পাখিগুলো উড়ে যেত। সারাদিন আর দেখা নেই। আবার সন্ধ্যার ঠিক আগে দলে দলে ফিরে আসত—কিছুক্ষণ চলত খুব জোর কিচির-মিচির তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে যেত—যেন যাদুমন্ত্রে কেউ হাজার পাখির চোখে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। সারা রাত অতবড় গাছটার পত্র-পল্লবে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কোটরে কোটরে সহস্র সহস্র পক্ষীপ্রাণ

সুপ্তিতে স্পন্দনহীন হ'য়ে থাকত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পাখিগুলির এই সুনিয়ন্ত্রিত আচরণ বিস্ময়কর নয় কি ?

* * * *

একবার নিমন্ত্রণ এল এক দূর গাঁয়ের মিরি গাঁওবুড়ার বাড়ি থেকে। আসামের বড় উৎসব বিহু উৎসব। বর্ষশেষে সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এই উৎসবের অনুষ্ঠান। গাঁয়ে গাঁয়ে আনন্দের সাড়া জেগে উঠে। নাচে গানে তরুণ-তরুণীরা মেতে উঠে ঃ

চৈত মাহর বিহুতে
ডাক বাংলার কাখতে
কোমর হিলাই হিলাই নাচিছিলা
মোর মরমর ময়না রে।

গ্রাম্য প্রেমগীতির অর্থ সুস্পষ্ট।

আসামের গ্রামাঞ্চলে ঘরে ঘরে তাঁত। তাঁতশিল্প এদেশের অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় শিল্প। প্রাচীনকালে প্রথা ছিল যতদিন পর্যন্ত না ছোট মেয়েরা নিজ হাতে কাপড় বুনতে পারবে ততদিনই তারা থাকবে অবস্ত্রা। যে মেয়ে যত ভাল কাপড় বুনতে পারবে তার তত ভাল বর জুটবে। বিহু-উৎসব মুখ্যতঃ অসমীয়াদের উৎসব। কিন্তু আনন্দের ছোঁয়াচ অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকেও সংক্রামিত করে তুলত।

মিরিগাঁও বহুদূরের পথ। বড়রা যাবেন সাইকেলে, কিন্তু আমারও যে নিমন্ত্রণ। বাবাকে গাঁওবুড়া বার বার খোকাবাবুকেও নিয়ে যেতে বলে গিয়েছে। আমি'ত আনন্দে আত্মহারা, নিমন্ত্রণে যাব—এই আশায়। কিন্তু যাই কি ক'রে? সেটাই দাঁড়াল বড় সমস্যা। কেউ একজন আমাকে ওঁর সাইকেলের সামনে

ক্যারিয়ারে বসিয়ে নিয়ে যেতে রাজী ছিলেন। কিন্তু অনেক দূরের পথ তায় রাত্রিবেলা। এ প্রস্তাবে বাবা রাজী হলেন না। শেষে একটা সুযোগ মিলল। পেরকা চৌকিদারকে সঙ্গে নেওয়া হ'ল। পেরকা চৌকিদার যেমন লম্বাচওড়া তেম্নি বলিষ্ঠ। আমাকে পেরকা কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে চলল। হাতে তার মস্ত বড় বল্লম। সঙ্গে আরও দুজন সঙ্গী জুটল—গোবর্ধন মুহুরী আর পাইকর গাড়োয়ান। আমি শক্ত মুঠোয় পেরকা চৌকিদারের বিশাল পাগড়িটা চেপে তার ঘাড়ে বসে রইলাম। মিরিগাঁওয়ে পৌঁছে গেলাম সকাল সকাল—তারপর নিমন্ত্রণ রক্ষার পর বাসায় ফিরে এলাম। রাত তখন প্রায় বারোটা। গাঁওবুড়ার বাড়িতেই আমন্ত্রিতদের আহারের ব্যবস্থা অর্থাৎ রান্নাবান্না হয়েছিল। আহারের উপকরণ বাহুল্যবর্জিত। ভাত, হরিণের মাংস আর চোঙ-দই। হরিণের মাংস এমনিতে রুক্ষ। তাই দিন কয়েক মাটিতে পুঁতে রাখা হয় তাতে মাংসে একটু পচন ধরে আর কিছুটা নরম হয়। হরিণ-মাংস খাওয়ার এটাই রীতি। কিন্তু অনভ্যস্তের পক্ষে সে মাংস খাওয়া কষ্টকর। অপর উপকরণ চোঙ-দই তার অবস্থাও তথৈবচ। মোষের কাঁচা দুধ বাঁশের চোঙায় জমিয়ে দই করা হয়। এ-দইয়ের স্বাদ-গন্ধও খুব উপাদেয় নয়। আধ-পেটা খেয়ে "বেশ খেয়েছি" ইত্যাদি মামুলী ভদ্রতাসূচক মন্তব্য করলেন বড়রা। যে পথ দিয়ে আবার পেরকা চৌকিদারের স্কন্ধারূঢ় হয়ে ফিরলাম সে পথের দৃশ্য আজও মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। একটা স্বচ্ছ কুয়াশার আবরণে চারদিক ঢাকা পড়েছে। সঙ্গীদের হাতে লণ্ঠন। কিন্তু লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে সামনের পথ বড় একটা দেখা যাচ্ছিলনা। উপরের আকাশে চাঁদ উঠেছে, কিন্তু

চাঁদও কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ম্লান। তবে কুয়াশা ভেদ ক'রে লাখ লাখ জোনাকির মিটি মিটি দ্যুতি। সারা পথ, প্রান্তর, ঝোপঝাড়, গাছপালা জোনাকিময়। কত অসংখ্য জোনাকি! যেখানেই কুয়াশা অপেক্ষাকৃত হাল্কা সেখানেই জোনাকির দীপ্তি। নিশীথিনীর যেন সে এক অপরূপ দেওয়ালী উৎসব!

নীলাচলবাসিনী:

আসামকে ঠিক যেন দু'ভাগে ভাগ করে প্রবাহিত হচ্ছে বিশাল-বক্ষ ব্রহ্মপুত্র নদ। এ বিশাল জলধারার কল্লোলধ্বনিতে মিশে আছে কত অতীতের কাহিনী। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তীয় আসাম অতি প্রাচীন দেশ। আর্যভূমির প্রাচীন কাহিনীমুখর ইতিহাস পূর্বপ্রান্ত সম্বন্ধে অনেকখানিই নীরব। উত্তর-পশ্চিম গিরিসঙ্কট দিয়ে যে শকহূণদল পাঠান মুঘল যুগে যুগে ভারতভূমিতে প্রবেশ করেছিল তাদের কথাই আমরা বেশী জানি। পূর্বপ্রান্তীয় আগন্তুকদের খবর ততটা রাখি না। মহাভারতের যুগ থেকেই কামরূপ আর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের খ্যাতি। আজকালের গৌহাটি শহরকেই মহাভারতবর্ণিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ব'লে গণ্য করা হয়। গুবাক্ বা গুয়া মানে সুপারি। গুয়াহাটির অপভ্রংশ হয়তো বা গৌহাটি। সে কথা থাক। তবে আসামে গুয়া বা সুপারির প্রাচুর্য যত্রতত্র। পান তাম্বুল (কাঁচা সুপারি) অসমীয়াদের অতি প্রিয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিস।

গৌহাটি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দির।

কামাখ্যা বরদা দেবী
নীলা পর্বতবাসিনী,

ত্বাং দেবি জগন্মাতা
যোনিমুদ্রা নমস্তুতে।

এ-মন্ত্র ছোটবেলায় মায়ের মুখে শুনেছি। কামাখ্যাপীঠ তীর্থময় ভারতের একান্ন পীঠের অন্যতম। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দেবীদেহের যোনিদেশ পড়েছিল কামাখ্যা পাহাড়ে। কামাখ্যা তন্ত্র-সাধনার পীঠস্থান। প্রচলিত বিশ্বাস কামাখ্যায় গেলে মোহিনী নারীর মায়ায় পুরুষ মেষে পরিণত হয়। এ-বিশ্বাসের মূলে সত্য যতটুকুই নিহিত থাক না, কামাখ্যার পাণ্ডার সৌজন্য ও পরিচর্যায় মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় নেই। ভারতের যাবতীয় তীর্থের সহিত তুলনায় কামাখ্যা তীর্থ এবিষয়ে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। যে পাণ্ডার বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম তিনি শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণ। আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় অতি অমায়িক। স্বহস্তে রন্ধন ক'রে অন্নব্যঞ্জনাদি ও ফলমূল দিয়ে আমাদের পরিতৃপ্ত করেছিলেন। দক্ষিণার কথা উল্লেখ করায় সবিনয়ে বললেনঃ আপনাদের যা ইচ্ছা। আমরা সংখ্যায় ছিলাম পাঁচজন। দশ টাকা দেওয়া হ'ল। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

নীলাচল পাহাড়ের চূড়ায় কামাখ্যাদেবীর মন্দির। এখান থেকে কামরূপের অনেকখানিই চোখে পড়ে। পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বিশাল রজত-শুভ্র ব্রহ্মপুত্র নদ প্রচণ্ড গতিতে প্রবহমান। দূরে অপর তীরে আমিনগাঁও রেল-স্টেশন। পাশেই একটা অনতিউচ্চ পাহাড়ের মাথায় স্টেশনমাস্টারের বাংলো। মনে হয় যারা ঐ সুন্দর ছবির মতো বাংলোর অধিবাসী তারা না জানি কত সুখী। ঠিক মাঝ-নদীতে চড়ার উপর সাদা পাথরের একটা স্তম্ভ—এদ্বারা বর্ষায় নদীর জলস্ফীতির পরিমাণ নির্ধারিত করা হয়। গৌহাটির

অপরপাড়ে বশিষ্ঠ আশ্রম ও অশ্বক্লান্ত। বহুতীর্থযাত্রী কামাখ্যা দর্শন সেরে নৌকাযোগে অপর পাড়ে যায়। মাঝে মাঝে নৌকা-ডুবির দুর্ঘটনায় যাত্রীরা প্রাণ হারায়, কিন্তু আনাগোনার বিরাম নেই। আমিনগাঁও ঘাটের বিপরীত তীরে পাণ্ডুঘাট। এখন নর্থওয়েস্টার্ণ রেলপথের প্রধান ঘাঁটি। আর কাছেই গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরের পত্তন। তখনকার দিনে এ-সব ছিল না। তখনও আসাম ও বাংলাদেশের হাইকোর্ট আর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এক। সেদিনের গৌহাটি আর আজকের গৌহাটি—এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি। আয়তনে আজকের গৌহাটি তার পুরানো গৌহাটির প্রায় তিন-চার গুণ। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন রেল-ঘাঁটি আরও বহু নূতন প্রতিষ্ঠান এখানে স্থাপিত হয়েছে। লোকসংখ্যা আর বাড়িঘর বেড়েছে প্রচুর। ঐশ্বর্য ও আয়তনে গৌহাটি এখন একটা বেশ বড়রকমের শহর। কিন্তু আর একদিকে গৌহাটি যা হারিয়েছে তার মূল্যও বড় কম নয়। সেই সুরম্য, ফিটফাট শহরটি আর নেই। ব্রহ্মপুত্রের ধারঘেঁষে যে তরুছায়াচ্ছন্ন পথটি চলে গিয়েছে পাণ্ডু এবং কামাখ্যা অবধি তার সৌন্দর্য আজ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে নূতন-ওঠা দালান, বাড়ি ও দোকান-ঘরে। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বলি দেয়, প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নিতে সুযোগ ছাড়ে না। গৌহাটি-আমিনগাঁও-পাণ্ডু অঞ্চলের দৃশ্যটি বর্ণনাতীত মনোরম। শ্যামশৈলশ্রেণী চতুর্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত। সেই শৈলভূমির মধ্যভাগ বিদীর্ণ ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের বিশাল জলধারা। এখানে-ওখানে খণ্ড খণ্ড সমতল ভূমিতে ও পাহাড়ের সানুদেশে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট গ্রাম আর শহর। কি সূর্যোদয়ে কি সূর্যাস্তে আলোর প্লাবনে

পাহাড়, বনভূমি আর ব্রহ্মপুত্রের রূপালী জলধারা মানুষের চোখে এঁকে দেয় এক স্বপ্নময় মোহাঞ্জন। কামরূপ, কামাখ্যা বা কামপীঠের সঙ্গে ভারতীয় তন্ত্র-সাধনার ঐতিহ্য যুক্ত। নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে কামাখ্যা মন্দিরের উৎপত্তি সম্বন্ধে।

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে
করেছ একি সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ?

হরনেত্রানলে দগ্ধ কামদেব রতির তপস্যায় পূর্বরূপ ফিরে পেয়েছিলেন এই স্থানে—তাই কি এর নাম কামরূপ !

পৌরাণিক যুগের আদি কামাখ্যাপীঠ বহুদিন লুপ্ত অবস্থায় ছিল। তারপর স্বয়ং দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কোচবিহাররাজ বিশ্বসিংহ এই লুপ্ত মহাপীঠের উদ্ধারসাধন করেন। সে-মন্দিরও হিন্দুমন্দির-বিধ্বংসী কালাপাহাড় কর্তৃক বিনষ্ট হয়। তারপর ষোড়শ শতকে কোচবিহার রাজবংশীয় বীর শুক্লধ্বজ বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি প্রস্তরনির্মিত, উপরিভাগ অনেকটা উল্টান ঝুড়ির মতো। সোপান বেয়ে ভূগর্ভস্থ কামপীঠ বা মহামুদ্রা দর্শন করতে হয়। কোন বিগ্রহ নেই। একটি দ্বিধা-বিভক্ত শিলাখণ্ডই কামপীঠের প্রতীক। কাছেই সৌভাগ্যকুণ্ড—সর্বতীর্থের জলে এই কুণ্ড পরিপূর্ণ। অবগাহনে সৌভাগ্যোদয় সুনিশ্চিত। কামরূপ বা আসামে স্মরণাতীত কাল হতেই তন্ত্রসাধনার প্রভাব। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক শঙ্করদেব আসামে প্রেমধর্মের প্রবর্তন করেন। আসামের অধিবাসিগণ শঙ্করদেবকে ঈশ্বরাবতার বলে ভক্তি করে। অহোমরাজ রুদ্রসিংহ স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এবং তারপর সারা আসামে বৈষ্ণবধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কামাখ্যাপীঠে তন্ত্রের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

কামরূপের নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মন্দির আর দেবস্থান। গৌহাটিতে খেয়াঘাটের কাছে শুক্লেশ্বরের মন্দিরে পাষাণ প্রাচীরে খোদিত বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্যের সুরম্য মূর্তি। অনতি-দূরে একটি অনুচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় নবগ্রহ মন্দির। গৌহাটির নয় মাইল দূরে মনোরম বশিষ্ঠাশ্রম। মহর্ষি বশিষ্ঠ এখানে সুদীর্ঘ ছয় হাজার বৎসর কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। নির্জন তপঃসাধনার পক্ষে এমন শান্ত সুন্দর তপোবন আর কোথায় আছে? পত্রপল্লবঘন অরণ্যের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করে একটি পাহাড়ী নির্ঝরের কলধ্বনি। সেই নির্ঝরের তীরে অতি প্রাচীন বশিষ্ঠ মন্দির।

নিকটেই সন্ধ্যাচল—মহর্ষির তপস্যাসন। সন্ধ্যা, ললিতা ও কান্তা পাহাড়ী ঝরনার ত্রিধারা। এ ধারা তিনটির পাশেই বশিষ্ঠদেব প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করতেন। যে শিলা-খণ্ডগুলির উপর বসে মহামুনি তপস্যায় মগ্ন হতেন, সেগুলি আজও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। গৌহাটির একদিক দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র, আর তিন দিকে মন্দিরশীর্ষ পাহাড়। ব্রহ্মপুত্রগর্ভে আছে অশ্বক্লান্ত নামে দ্বীপ। অশ্বক্লান্ত কুণ্ডে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করণীয়। এখানে আছেন অনন্তশয়ন বিষ্ণু আর কূর্মরূপী জনার্দন মূর্তি। এই মন্দিরের নিকটেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত ক'রে যুদ্ধক্লান্ত অশ্বকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন। সেই থেকেই এই স্থানের নাম অশ্বক্লান্ত। পর্বতগাত্রে এখনও একটি অশ্বখুরের চিহ্ন দেখা যায়। অশ্বক্লান্তের মতই ব্রহ্মপুত্রের আর তুটি দ্বীপ—উমানন্দ ও উর্বশী। উমানন্দ ভৈরবের মন্দির শিবরাত্রি উৎসবে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশে কলমুখর হয়ে উঠে।

আর উমানন্দ পাহাড়ের পাদদেশেই ধ্যানরত মহাদেবের ক্রোধানলে রতিপতি ভস্মীভূত হয়েছিলেন—এ কিংবদন্তীও প্রচলিত।

গৌহাটি আসামের সিংহদ্বার। একে রক্ষা করছে প্রাকৃতিক পরিখা ব্রহ্মপুত্র নদ আর পাহাড়ের প্রাচীর। আর্য সভ্যতা ভারতের পূর্বপ্রান্ত আসামে অনুপ্রবেশ করেনি, আর করলেও খুব ক্ষীণধারায়। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার-নীতিও বহুদিন পর্যন্ত বঙ্গদেশ অতিক্রম ক'রে আসামে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় নি। প্রথম প্রয়াস দেখা যায় সতের শতকে ঔরঙ্গজেবের আমলে। বিখ্যাত মুঘল সেনাপতি মীরজুমলার নৌ-বাহিনী কর্তৃক আসাম আক্রান্ত হয়েছিল। তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল ব্রহ্মপুত্রবক্ষে। কিন্তু মীরজুমলার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় অহোমবীর চক্রধর সিংহ, জয়সিংহ আর গদাধর সিংহের পরাক্রমে। পরাজিত মুঘলবাহিনীর বহু কামান অহোমদের হস্তগত হয়। সেই কামানগুলি গৌহাটির যাদুঘরে আজও দেখা যায়। তাদের গায়ে প্রাচীন অসমীয়া হরফে লিখিত অহোম বীরগণের নাম ও বিজয় কাহিনীর কথা সংক্ষেপে উৎকীর্ণ আছে।

এক হাতে তারা মগেরে রুখেছে
মোগলেরে আর হাতে।

প্রকৃতির লীলাভূমি আসাম। পর্বতমেখলা, অরণ্যস্নিগ্ধ, নদনদী-বিধৌত ভারতের এই প্রান্তদেশটির সৌন্দর্যের তুলনা নেই। সেই কবে বহুদূরাপসৃত বাল্যস্মৃতির পটে যে ছবিটি আঁকা হয়ে গেছে আজ ধূলিমলিন সংগ্রাম-বিধ্বস্ত জীবনের ক্ষণাবকাশেও তার বর্ণালি এতটুকু ম্লান হয় নি। এখনও সেই নিরুপমা ধরিত্রী জননীর মমতা-মধুর হাসির ছটায় অন্তরের অন্তর্লোক উদ্ভাসিত

হয়ে উঠে। আসামের অরণ্য-পর্বত, আসমের চা-বাগান, পাহাড়ী বস্তী, কলমুখর উপলব্যথিতগতি ঝরনা ধারা, সেই মিরি-মিশমি-নাগা-কুকি-আকা-ডফ্‌লা জাতীয় মানুষের আদিম সারল্য, আর শৈশবের সেই নিরুদ্বিগ্ন দিনগুলির স্মৃতি দুর্নিবার আকর্ষণে হারানো অতীতকে নিয়ে আসে মনের দুয়ারের অতি নিকট, অতি নিবিড় সান্নিধ্যে।

অমরকণ্টকের পথ

নামটা যেন জানা জানা···

"বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি ;
তাড়াতাড়ি নামতে হ'ল।
ছ'ঘণ্টাকাল যাত্রীশালায় থামতে হ'ল !"

কবিগুরুর "ফাঁকি"—সেই ছন্দোমধুর সকরুণ কাহিনী যে মনে গাঁথা হয়ে আছে। দুর্বল স্মৃতিশক্তি জীবনে বহুবার বহুক্ষেত্রে বঞ্চনা করেছে। এবার কিন্তু এতটুকু ফাঁকি দেয়·নি!

প্ল্যাটফর্মের একধারে বড় পাথরের ফলকে ইংরাজীতে লেখা নামটার দিকে তাকাতেই বিলাসপুরের পূর্বপরিচয় ফিরে পেলাম। সহযাত্রী মারাঠি বন্ধু শঙ্করদাস ভানুরাম ধৈর্যবান প্রস্তাব করলেন ব্রেক-জর্নি ক'রে অমরকণ্টক দেখে গেলে হয় না। অতি উত্তম প্রস্তাব। পথ অজানা, পাথেয় সামান্য, যানবাহন কি মিলবে কে জানে! কিন্তু অনিশ্চয়তাই অমরকণ্টক যাত্রার ইচ্ছাকে তীব্র ক'রে তুলল। অজানা যাত্রার আকর্ষণ যেন প্রবল হয়ে উঠল। ইতিহাসে অমরকোট নামটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু সে অমরকোট

আর এ অমরকণ্টক এক নয়। অমরকোট রাজস্থান-সিন্ধুর উষর মরুভূমিতে একটি নগণ্য স্থান পৃথিবীখ্যাত মুঘলসম্রাট আকবরের জন্মস্থান। অমরকণ্টক ভারতের অগণিত হিন্দুতীর্থের অন্যতম। সাতপুরা পর্বতমালার পূর্বাংশে সাড়ে তিন হাজার উচু শৈলশিখরে একটি শৈব তীর্থ। বিলাসপুর হ'তে ছোট্ট রেলগাড়ি যায় পিঁধারা রোড স্টেশন অবধি। বিলাসপুর কাটনি শাখা লাইন অমরকণ্টক মালভূমি অতিক্রম ক'রে ষাট-বাষট্টি মাইল পথ পিঁধারা রোড অবধি গিয়েছে। দারজিলিং-হিমালয়ান রেলপথের মতই এপথ দৃশ্যময়।

গাড়ির সামনে পিছনে দুইটি ছোট ইঞ্জিন—একটায় টানে আর একটায় ঠেলে, তবে গাড়িগুলি পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, চড়াই ঠেলে উপরে উঠতে পারে। অমরকণ্টকের বন ঘনসন্নিবদ্ধ, এর শ্যামলতারও বুঝি তুলনা নেই। গাড়িতে ব'সেই হাত বাড়িয়ে দু'পাশের গাছপালার পত্রপল্লব ছোঁয়া যায়। বড় ছোট মাঝারি নানা রকমের গাছ। শালের প্রাচুর্য বেশী। কিন্তু গাছ-গাছালির এত ঠাসাঠাসি ভীড় অন্য কোন বনে দেখিনি। গাছে গাছে জড়িয়ে একেবারে নিশ্ছিদ্র নিরন্ধ্র অবস্থা। আর গাছে গাছে ফলের কী বাহার। বড় বড় আকারের ও কমলালেবুর মত রঙের লেবু অজস্র গুচ্ছে গুচ্ছে ফলে রয়েছে যেন কেউ এসে আহরণ করবে তারই প্রতীক্ষায়। আহরণ করে আনাও যায়। কিন্তু এনে হবে কি? বিষম টক—বাঘা তেঁতুলকেও হার মানায়। পেয়ারার মতো একজাতীয় বুনো ফল—কষ্টি কষ্টি। চালতা, ডুমুর ও জংলী কলার ছড়াছড়ি। ডুয়ার্সের জঙ্গল, আসামের বন বা নীলগিরি অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে এত রকমারি ফলের সন্ধান পাইনি।

ষাট-বাষট্টি মাইল রেলপথের সবটাই বৈচিত্র্যময়। দৃশ্যের পর দৃশ্য ছায়া-ছবির মিছিলের মতো চোখের উপর দিয়ে লঘু ক্ষিপ্রতায় একের পর একটা মিলিয়ে যায়—কিন্তু এই ছবির মিছিলের যেন শেষ নেই! বুভুক্ষিত চক্ষুরও ক্লান্তি নেই। অসংখ্য খরস্রোতা নির্ঝরিণীর ফেনিল কলোচ্ছ্বাস এই দৃশ্য বৈচিত্র্যকে আরও রমণীয় ক'রে তুলেছে। রেলপথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে আবার কোথাও পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ ক'রে এগিয়ে গিয়েছে। পথে কয়েকটা সুড়ঙ্গ পড়ল।

সুড়ঙ্গের ভিতর যখন গাড়িটা ঢোকে তখন হঠাৎ সব ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকার। গাড়ির ভিতর নিজের হাতখানাও চোখে দেখা যায় না। কোন কোন সুড়ঙ্গ বেশ লম্বা, পার হতে ৩।৪ মিনিট সময় লাগে। নিরেট কঠিন পাথর ডিমামাইটের সাহায্যে ফাটিয়ে রেল যাবার জন্য সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে। ছেলেবেলায় আসাম যাবার কালে লামডিং-বদরপুর রেলপথে এরকম সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। তাই আমার কাছে সুড়ঙ্গ-পথ তেমন নতুন কিছু নয়। কিন্তু গাড়ির অপরাপর সহযাত্রী কারো কারো মুখেচোখে একটা ভয়-তরাসের ভাব ফুটে উঠেছিল।

বলাবাহুল্য থার্ড ক্লাশের যাত্রী আমরা সবাই। আর গাড়িতে একটি বাদে আর সব কামরাই জনপ্রিয় থার্ড ক্লাশ। চলন্ত গাড়ির গতিবেগের সাথে পথের দু'পাশের অনুপম শোভায় মনটা খুশিতে মগ্ন ছিল, এর মধ্যে রসভঙ্গ ঘটল। এক মস্ত জোয়ান উঠল গাড়িতে। বেঞ্চের যে ধারটায় একটু নিরিবিলিতে বসেছিলাম, সেই নরপুঙ্গবের নজর সে দিকেই। হাতে কোৎকা লাঠি, মাথায় বিরাট পাগড়ি, পায়ে ধূলিধূসর নাগরা, গোঁফ

ও জুলফি সবই প্রমাণসই আকার-সদৃশ। লাঠি ঠুকে সশব্দে এগিয়ে এসে আমাকে লক্ষ্য ক'রেই হুঙ্কার দিল: "জায়গা ছোড়কে বৈঠ, হমভি যানা।" জায়গা যথেষ্টই ছিল। কিন্তু দুর্জনকে যুক্তি প্রদর্শন নিরর্থক। আর লোকটার দৈহিক আকার ও মারমুখী আচরণে স্পষ্টই একটা যুদ্ধং দেহি মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

ভদ্র মোরা শান্ত অতি পোষমানা এ প্রাণ,
বোতাম আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।

একে শান্ত গোবেচারী বাঙালী, তায় বিদেশবিভূঁই। বিনা বাক্যব্যয়ে সেই ষণ্ডামার্কা লোকটাকে নিজের অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। আর সে লোকটা তার বোঁচটা পাশে রেখে গ্যাঁট হয়ে বসল। প্রথমে খৈনি ও তারপর বিড়ি সেবনে প্রবৃত্ত হ'ল। সাময়িক মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও মনটাকে আবার ফিরিয়ে নিলাম প্রকৃতির অকৃপণ রূপসজ্জার দিকে। গাছপালার স্নিগ্ধ নিবিড় শ্যামলিমা আর নীলিম আকাশে প্রভাতের কণকদ্যুতি আবার মনকে তলিয়ে নিয়ে গেল অন্তরের অন্তর্লোকে। 'শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল'— এইত সেই পরম রমণীয়, পরম মনোহর সত্যসুন্দর! নিজের খুশিতে নিজে তন্ময় হয়ে আছি, হঠাৎ নজর পড়ল সেই লোকটার দিকে। যেন কিছু বলতে চায়। বোধ হয় ভেবেছিল আমরা তার কথার প্রতিবাদ করব, আর একটা বচসা বাধবে। কিন্তু সেসব কিছুই না ঘটায় লোকটা যেন একটু মনঃক্ষুন্নই হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে আমায় জিজ্ঞাসা করল: "আপ বাংলা মুলুকসে আয়া?" আমি সংক্ষিপ্ত জবাবে 'হ্যাঁ' বলেই চুপ ক'রে রইলাম।

কিন্তু লোকটা আলাপ জমাবার জন্য যেন উসখুস করছে। প্রথমে শুরু করেছিল 'তুম' দিয়ে এখন 'তুম' ছেড়ে 'আপ' ধরেছে। আবার খানিকক্ষণ পরে প্রশ্ন হ'ল—"আপ ডগ্‌ডর সেন সাবকে পচান্তে হ্যায় ?"

"কোন ডগ্‌ডর সেন ?"

পাটনেকা।

"নেহি মেরা মালম নেহি হ্যায়।"

কিছুক্ষণ যায়। আবার প্রশ্ন হল :

"ডগ্‌ডর বোসকো জানতা হ্যায় ?"

"নেহি, লেকিন কাঁহাকা ডগ্‌ডর বোস ?"

ছাপরাকা।

লোকটা খালি ডাক্তারের খোঁজ করে কেন ? অতঃপর জিজ্ঞাসা করলাম : এত ডাক্তারকে সে চিনে কোন সুবাদে ? এর উত্তরে যা বলল তা নিয়ে বেশ একটা গল্প তৈরী করা যেতে পারে।

অসহ্য শিরঃপীড়ায় সে ভুগছে। বহু ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েছে। অনেক ওষুধপত্র খেয়েছে। খরচপত্রও হয়েছে অনেক কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। ডগ্‌ডর সেন আর ডগ্‌ডর বোস্ উভয়েই খ্যাতনামা চিকিৎসক, কিন্তু তাঁদের চিকিৎসাও বিফল হয়েছে। যখন মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় তখন তার মনে হয় সে পাগল হয়ে যাবে। অথচ স্বাস্থ্য খুবই ভাল—রীতিমত বলিষ্ঠ দেহ এবং বয়স চল্লিশের নিচে। এইভাবে অনেকক্ষণ লোকটা তার কাহিনী বিবৃত ক'রে গেল। নাম গোলকরাম। বাড়ি গয়ার কাছে কোন একটা দেহাতি অঞ্চলে। কথাবার্তায় মনে হ'ল অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, জমি-জমা, বিষয়-আশয় এবং মান-প্রতিপত্তি আছে।

এতক্ষণে গোলকরামের উগ্র ভাবটা অনেকখানি নরম হয়ে এসেছে। বুঝলাম লোকটার কাহিনী সত্য, এবং তার শিরঃপীড়াটাও দুরন্ত রকমের। তার কাহিনী শুনতে শুনতে কেন যেন মনে হ'ল লোকটা নিশ্চয়ই কোন জঘন্য অপরাধে অপরাধী—হয়তো বা খুনী। একটু চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলাম ঃ সাচ্চা বাত কহ—কভি কিসিকো খুন জখম কিয়া ? কথাটা প্রায় শেষ না হতেই লোকটা বেঞ্চ থেকে নেমে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরল। কাতর কণ্ঠে বলল,বাবুজী বিশোয়াস কীজিয়ে মেরা কুছ কসুর নেহি থা।" বিষয়টা সেই চিরন্তন স্ত্রীঘটিত। প্রতিবেশী পূরণ-চাঁদের অউরত বহুত খপসুরৎ। পরকীয়ার চর্চা করতে গিয়ে গোলকরাম পূরণ-চাঁদের বিরাগভাজন হয়। পূরণ-চাঁদ নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলে আর গোলকরামকে শাসায়। তাই একদিন হাট থেকে ফিরবার পথে নির্জন মাঠের মাঝে পূরণচাঁদ গোলকরামের অতর্কিত লাঠির আঘাতে নিহত হয়। পিছন থেকে মাথায় একটি মাত্র বাড়ি দিয়েই গোলকরাম তার পথের কণ্টক দূর করে। এ-খুনের কোন হদিসই হয় না। যথারীতি পুলিশ এসেছিল বটে। গোলকরামের উপর সন্দেহের কারণও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু টাকার জোরে গোলকরাম পুলিশের কাজ অনেকখানি সহজ ক'রে দিতে সমর্থ হয়। পুলিশের রিপোর্টে বলা হয় গাছের ডাল ভেঙ্গে মাথায় পড়ে পুরণচাঁদের মৃত্যু ঘটেছে। পুলিশের হাত হ'তে এত সহজে নিস্তার পেলেও, বিবেকের বিশ্চিক-দংশনে গোলকরাম নিরন্তর নিপীড়িত হ'তে থাকে। মুমূর্ষু পূরণচাঁদের যন্ত্রণা-কাতর বিবর্ণ মুখখানা নিদ্রায় ও স্বপ্নে গোলকরামকে অসহ্য পীড়া দিতে থাকে এবং সেই সময় থেকেই শুরু হয় তার শিরঃপীড়া। আমার কথায়

গোলকরামের বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমি দৈবজ্ঞ—ভূত ভবিষ্যতের সব খবরই আমার জানা, নইলে কেমন ক'রে তার নরহত্যার গোপন অপরাধের কথা জানতে পারলাম।

আমার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে আকুল মিনতি জানাতে লাগল ঃ বাবুজী মেরা বেমার খতম কর দি জীয়ে, আপকা গোড়কা বান্দা হো রহু।˙ আমি দৈবজ্ঞ নই—চিকিৎসকও নই। কি করি! গোলকরাম পা ছাড়েনা। অগত্যা বললাম ঃ দেখো দাওয়াইসে কুছ্ ফ্যয়দা নেহি হোগা, গঙ্গাজীকো শরণ লেও। গঙ্গা-পানি বহুত পবিত্র হ্যায়। তামাম রোজ গঙ্গামে সিনান করনা চাহি। গোলকরামের প্রত্যয় হ'ল। বারবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিল। তার গন্তব্যস্থল এসে গেছে। যাবার আগে তার ঠিকানা দিয়ে বারবার অনুরোধ জানাল তার গাঁয়ে তার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। আমার ঠিকানাও চাইল। আমি কিন্তু তাকে আমার ঠিকানা দেই নি। এদিকে পিঁধারা-রোড স্টেশনে এসে গেছি। গোলকরামের সঙ্গে কথায় কথায় সময় কোনদিক দিয়ে কেটে গেল টেরও পাই নি।

পিঁধারা থেকে অমরকণ্টক ত্রিশ মাইল। তখন বেলা দশটা। সংক্ষেপে নিত্য কৃত্যাদি সেরে রওনা হবার উদ্যোগ করা গেল। বাহন মিলল দু'টো টাট্টু ঘোড়া, ঘোড়ার জিম্মাদার একজন, আর মাল বহনের জন্য দু'জন কুলি। ভাড়া যাতায়াতে মোট পঞ্চাশ টাকা। সস্তা বলতে হবে। যে পথ দিয়ে অমরকণ্টক যেতে হবে তা তখনও মোটর গাড়ি চলবার উপযোগী হয়নি। তবে শুনলাম পথ তৈরীর পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। রওনা হতে প্রায় ১২টা বেজে গেল। ত্রিশ মাইলের মাঝামাঝি

পনর মাইলের মাথায় পড়ে সিদ্ধবাবা। জনমানবহীন দেওস্থান। আমাদের ইচ্ছা এখানে যদি কোন বাস যোগ্য আস্তানা মেলে তবে এখানে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার অমরকণ্টকের পথ ধরব। আমাদের নীতি গো-ইজি (go easy)। অত তাড়াহুড়ার কি আছে!

সেই পূর্ববৎ পাহাড়ী পথ—কোথাও সমতল, কোথাও চড়াই উৎরাই। ছ'পাশে বন। গাছে গাছে দোত্বল্যমান ফলসম্ভার অজ্ঞ পথিককে প্রলুব্ধ করছে। অতি বিপদসঙ্কুল স্থান। এ বন ব্যাঘ্রের বিচরণ-ভূমি। ভল্লুকের বিষম উৎপাত। পথে দলবদ্ধ তীর্থযাত্রী ভিন্ন অন্য পথচারীর দর্শন অতি কমই মেলে। যে অঞ্চল দিয়ে অমরকণ্টকের পথ চলে গিয়েছে তা নর্মদা-শোন-মহানদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিধৌত। পথে কত যে ছোট ও মাঝারি রকমের নদী নালা পার হতে হ'ল তার হিসেব রাখা মুস্কিল। ঘোড়ার পিঠে চেপেই নদীর খাদে নামতে হয়। জলের গভীরতা খুব বেশী নয়—বড় জোর ঘোড়ার পেট অবধি জলে ভিজে। জল যেন বরফ, লাগলে হাত কনকন করে। নালাগুলি খরস্রোতা। স্রোত এত তীব্র যে সাবধান না হ'লে ঘোড়ার পদস্খলন হওয়ার আশঙ্কা, আর তা'হলে আরোহীর নাকানি-চুবানি অনিবার্য। জিম্মাদার আমাদের ছ'জনের ঘোড়া ছ'টাকে জায়গায় জায়গায় এক এক ক'রে জল পার করিয়ে দিল।

সিদ্ধবাবা বাঘের দেবতা—সোঁদরবনের বনবিবিও দক্ষিণ-রায়ের সমতুল্য। যখন সিদ্ধবাবায় গিয়ে পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত প্রায়। পাহাড়ের একগুহায় এক সাধুর বাস। তিনি নাকি মন্ত্র-সিদ্ধ। একখানা প্রস্তরখণ্ড দেওস্থানরূপে নির্দিষ্ট। যাত্রিরা এখানেই

পূজা দেয়। আমাদের সঙ্গীরা নারিকেলের তৈরী মিষ্টান্ন দিয়ে পূজা দিল। সাধুবাবার সেবার জন্য দিল আটা ও ঘৃতের সিধা। সব তীর্থকামী-ই দিয়ে থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস, সিদ্ধবাবার পূজা দিলে বাঘের ভয় থাকে না। সাধু-বাবার আশ্রমের নিকটেই কয়েকটি খালি চালাঘর। রাত্রির মতো সেখানেই আশ্রয় নিলাম। ঘোড়া-গুলিকেও একটা ঘরে রাখা হ'ল। কি জানি যদি বাঘে ধরে।

প্রায় ৮।৯ ঘণ্টা একটানা বন্ধুর পার্বত্য পথে অশ্বারোহণে যাত্রা যে অতি সুখকর নয় তা বলাই বাহুল্য। পথশ্রম হয়েছিল বিষম। এ-দিকে শীতও প্রখর। চালাঘরগুলি অপ্রশস্ত। ধৈর্যবান ও আমি একটায় আশ্রয় নিলাম। অন্যেরা আর একটায়। সঙ্গে আনা শুকনো লাড্ডু সহযোগে সাধুবাবার হাতের রান্না খান দুই রুটি দিয়ে রাতের ভোজন সমাপ্ত করলাম। তারপর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আধ-খোলা হোল্ড-অলে কম্বল মুড়ি দিয়ে দুর্গা নাম নিয়ে নিদ্রার আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করলাম। রাত্রে সাধুবাবা বড় কাঠের গুঁড়িতে আগুন দিয়ে ধুনি জ্বালিয়েছিলেন। রাতে বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় প্রজ্বলিত আগুন। মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও নাকি ঘটেছে যে আগুন কখন নিভবে সেই অপেক্ষায় বাঘ অদূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তারপর আগুন নিভে গেলে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে শিকার ধরেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল, রাতে বাঘের কোন উপদ্রব হয়নি। সিদ্ধবাবাকে পূজা দেওয়ার ফলেই হোক আর যে কারণেই হোক, অক্ষত দেহে মানুষ আর ঘোড়া সবাই পরদিন প্রত্যূষে অমর-কণ্টকের পথে রওনা হলাম!

অমরকণ্টক নামটায় কবিত্ব আছে। ভক্তজনের বিশ্বাস এ-

তীর্থদর্শনে জীবজন্মের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। অমরত্ব বা মোক্ষলাভের সব বাধা বা কণ্টক দূর হয়ে যায়। পথ এখনও পনর মাইল বাকি। কল্পনা-রোমন্থন স্থগিত রেখে অশ্বপুঙ্গবকে হাঁকাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ-ব্যাপারে যে একান্তই অপটু ও অনভ্যস্ত। ভাগ্যিস John Gilpin কবিতাটা পড়া ছিল তাই নিজে বাহাদুরি না দেখিয়ে জিম্মাদারের শরণাপন্ন হলাম। জিম্মাদার ও ঘোড়ায় খুব চমৎকার সাট। জিম্মাদার একবার আমার ঘোড়া, একবার ধৈর্যবানের ঘোড়ার কানে কানে কি বলে আর অম্নি ঘোড়া দু'টার গতিবেগ বেশ দ্রুত হয়ে উঠে। আমরা ঘোড়ায় যাচ্ছি আর যারা পিঠে বোঝা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা কিন্তু আমাদের সমানে সমানেই যাচ্ছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতি মানুষ।

বিকেল তিনটা নাগাদ অমরকণ্টকের কাছাকাছি পৌঁছান গেল। পথ এখানে দ্বিধা বিভক্ত। একটা গেছে অমরকণ্টক আর অন্যটা দুই মাইল দূরবর্তী কপিলধারা তীর্থে। আমাদের মাল-পত্র অমরকণ্টকে পাঠিয়ে কপিলধারা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম। কথা রইল কপিলধারা দর্শন শেষ ক'রে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় অমরকণ্টক ফিরে আসব। জিম্মাদার ও তার লোকেরা এ-সব অঞ্চলে ওয়াকিফ-হাল ও নির্ভরযোগ্য। তারা অমরকণ্টক গিয়ে আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে রাখবে।

কপিলধারা—সাংখ্যদর্শন রচয়িতা মহামুনি কপিলের নামযুক্ত এ তীর্থ। সাতপুরা-সুতা নর্মদা চঞ্চলা নটীর মতো চপল চরণ-ক্ষেপে শিখর হ'তে শিখরে সঞ্চরণশীলা। পাঁচশত ফুট উচ্চ শৃঙ্গ হ'তে উচ্ছল জলধারা প্রবল তাণ্ডবে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। দূর

থেকেই সেই কল্লোলধ্বনি শ্রুত হয়। স্থানটি অতি নির্জন ও শান্ত। সাধন ভজন ও ঈশ্বর চিন্তার পক্ষে একান্ত লোভনীয়। নর্মদা প্রপাতের ধারে কাছে সাধুর আশ্রম! আশ্রম-প্রাঙ্গন অতি পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি ক'রে সাজান। গোলাপের বাগানে ফুল ফুটেছে অপর্যাপ্ত। সাধুরাই উদ্যান রচনা করেছেন। সুন্দরের মধ্য দিয়েই যে পরম সুন্দরের আকিঞ্চন। সারা ভারতই তীর্থময়। আর এই তীর্থগুলির ধূলিমাটি, মন্দির, মঠ আর উৎসব পার্বনের সঙ্গে মিশে আছে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, ভারত-আত্মার কালজয়ী বাণী। কিন্তু কোন তীর্থেরই বিজ্ঞানসম্মত নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যাবে না। পাওয়া যায় বহুবিধ প্রবাদ ও জনশ্রুতি। কপিলধারার বেলাতেই বা ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? শাঙ্খ্যকার কপিলমুনির আশ্রম দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতটে। মহারাজ সগরের ষাট হাজার পুত্র কপিলের রোষানলে ভস্মীভূত হয়েছিল। ধ্যানধারণার বিঘ্ন ঘটায় কপিলমুনি তাঁর পূর্বাশ্রম পরিত্যাগ ক'রে মধ্যভারতের অরণ্যপাহাড়-বেষ্টিত এই অতি নির্জন স্থানটি বেছে নিয়েছিলেন। এ হচ্ছে কপিলধারার প্রবাদ। মতান্তরে কপিলমুনি এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কপিলধারা দর্শন শেষ ক'রে অমরকণ্টক ফিরে চললাম।

দূর থেকেই সাড়ে তিনহাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত অমরকণ্টকের শ্বেত মন্দিরের চূড়াগুলি চোখে পড়ে। এদিকে সন্ধ্যা আসন্ন।

নামিছে নীরব ছায়া ঘনবন শয়নে।
এ-দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

কবি কার জন্য এ-ছত্র রচনা করেছিলেন? কবি-বাক্য সর্বজনীন।

ছায়ানিবিড় সায়ন্তনী প্রকৃতির এ অপরূপ আলেখ্যই যেন কবির অনবদ্য ছন্দে রূপায়িত হয়েছে ঃ

ঝলিছে সাঁঝের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া করা,
ছেয়ে গেছে ঝ'রে পড়া বকুলে।

সন্ধ্যা তখনও শেষ হয়নি। পশ্চিম আকাশে, পাহাড়ের চূড়ার মাথায় সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে! আমাদের সারাদিনের ধকল শেষ হ'ল। সুন্দর সুসজ্জিত সরকারী বিশ্রামাগারে আশ্রয় মিলল। আমাদের লোকেরা মালপত্র নিয়ে এরি মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছে।

ধৈর্যবান দু'দিন পরেই বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বিদায় নিলেন। বলে গেলেন আবার বিলাসপুরে দেখা হবে। আমি আরও দিন-কয়েক থেকে যাব মনস্থ করেছি। অধ্যুষিত জনপদ আর চলতি জনপথ উভয়েরই বাইরে অগম্য, নগণ্য স্থানগুলির প্রতি আমি যেন একটা সহজাত আকর্ষণ অনুভব করি। আজকাল বহুলোক সখ ক'রে পাঞ্চেৎ, মাইথন, দুর্গাপুর দেখতে যায়। আমিও এ-সব জায়গায় না গিয়েছি তা নয়, কিন্তু সখের বশে নয়, নেহাৎ দায়ে পড়ে। কিন্তু দুর্গাপুরের ব্লাস্ট ফার্নেসের চাইতে বেশী আকৃষ্ট হই অনতিদূরের শাল-মহুয়ার বনের প্রতি। ভিলাই-রাউরকেলা-সাক্‌চি দুর্গাপুর স্বাধীন ভারতের শিল্পতীর্থ। প্রধানমন্ত্রী জওহরলালজী থেকে শুরু ক'রে বহু ভি-আই-পি (very important person) ভারতীয় রূঢ়ের (Rhur) মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ। অমরকণ্টক

অঞ্চলের অনতিদূরেই এই নবভারতের রূঢ় । অনেকেই জিজ্ঞাসা করবেন ভিলাই, রাউরকেলা দেখেছি কিনা, এবং ধিক্কার দিবেন সে সব স্থানে যাইনি শুনে ।

কিন্তু আমি পাহাড়, বন, নীলিম আকাশ আর কলমুখর ঝরনা—প্রকৃতির রূপের এই বালাই নিয়ে মরি। তাই অমরকণ্টক ছেড়ে আর কোথাও যেতে মন সরল না। থেকে গেলাম এখানেই সাতদিন। ঘোড়া নিয়ে জিম্মাদার আর তার লোক দু'টি চলে গেল। আমি একা রেস্ট-হাউসে থেকে গেলাম। সঙ্গী কেউ নেই। রান্না করতে জানিনা। আমাকে দু'টি রেঁধে খাওয়ায় কে? অমরকণ্টক ছোটখাট শহর—খুঁজে পেতে একটা হোটেল আবিষ্কার করলাম, কিন্তু ভাগ্য ভাল হোটেলের ভাত খেতে হ'লনা। রেস্টহাউসের রক্ষক দীনদয়াল সব শুনে স্বেচ্ছায় আমার খাবার প্রস্তুত করার ভার নিল। দীনদয়াল, তথা দীনদয়াল-পত্নী রঙ্‌মতীকে অশেষ ধন্যবাদ। যে কয়দিন রেস্ট-হাউসে ছিলাম দীনদয়াল ও রঙ্‌মতীর অযাচিত সেবায় এতটুকু অসুবিধা বোধ করি নি। এরা স্বামী স্ত্রী অতি ভাল মানুষ, গরীব কিন্তু নির্লোভী। প্রতিদানে আমি অতি সামান্যই পারিতোষিক দিয়েছিলাম। উদরপূরণের চিন্তা হ'তে মুক্তি পেয়ে মনের খুশিতে অমরকণ্টক আর আশেপাশের জায়গাগুলি দেখে সময় কাটাতে লাগলাম। আর বাকী সময়টা কেটে গেল সঙ্গে আনা বইগুলির সদ্ব্যবহারে। এমন নিরিবিলি, নিরবচ্ছিন্ন অবসর জীবনে খুব কমই উপভোগ করেছি। তাই অমরকণ্টকের স্মৃতি মনের ফলকে অম্লান স্বাক্ষর রেখে গেছে।

অমরকণ্টকের প্রধানমন্দির শিবের। ছোট ছোট আরও কয়েকটি মন্দির আছে। আর আছে একটি পূতসলিল কুণ্ড।

নিরন্তর জলবুদ্বুদ উদ্গত হচ্ছে। এই কুণ্ডোত্থিত তিনটি জলধারা হ'তেই নর্মদা, শোন ও মহানদীর উৎপত্তি। তাই এই কুণ্ডের জল পবিত্র। শিবচতুর্দশী ও কার্ত্তিকপূর্ণিমায় এ কুণ্ডের জলে স্নান পরম পুণ্যের কাজ। এই উপলক্ষে এখানে ভারতের নানা দেশ হ'তে আগত যাত্রীর খুব ভীড় হয় প্রতি বৎসর। মন্দিরের বহির্ভাগে আছে এক মর্মর হস্তীর পৃষ্ঠারূঢ় মস্তকবিহীন কৃষ্ণ প্রস্তর-মূর্তি। এ-মূর্তির ভগ্নদশা সেই নরপশু কালাপাহাড়ের অপকীর্তির একটি নিদর্শন। ঐ প্রস্তর নির্মিত হাতির পেটের তল দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে প্রমাণ ক'রে দিলাম যে আমি অপাপবিদ্ধ। পাপীরা নাকি আটকা পড়বেই।

অমরকণ্টকের অনতিদূরে সোনামোড়া বাঘের জন্য কুখ্যাত। দু'মাইল রাস্তার ধারে ধারে পরিত্যক্ত চালাঘর ব্যাঘ্র-ভীতির সাক্ষ্য বহন করে। এখানে শোন নদের সমতল প্রবাহ অকস্মাৎ দুর্দম বেগে অনেকখানি নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ায় এক দর্শনীয় জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রপাতের নিকটেই এক সাধুর আস্তানা। এখানে বাঘের উৎপাত অত্যধিক। সন্ধ্যার পূর্বেও কখন কখন বাঘ জলের ধারে আসে। সাধু বললেন, বাঘের বাচ্চারা তার আশ্রমের সম্মুখে এসে কখন কখন চাদনী রাতে খেলা করে—মা বাঘিনী অদূরে বসে বাচ্চাদের ক্রীড়াকৌতুক উপভোগ করে।

রেস্টহাউসের বারান্দায় ইজি চেয়ারখানায় বসে সকাল-বিকাল খানিকটা পড়াশুনা করতাম। রেস্টহাউসের গেটের ঠিক বাইরে একটা ছায়াতরু। প্রতিদিন লক্ষ্য করতাম বেলা ৯টা নাগাদ সেখানে আসত একজন মুচি। তার পুঁটলিটা মাটিতে নামিয়ে একখণ্ড শুকনো চামড়া পেতে বসে থাকত খদ্দেরের আশায়।

বেলা তিনটা অবধি তাকে সেখানেই থাকতে দেখতাম। এর মধ্যে জুতো-শেলাই ও জুতো-পালিশের কাজ শেষ হয়ে যেত। প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে সেখানে আসত এক বৃদ্ধা ভিখারিণী আর প্রতিদিন দেখতাম সেই মুচি তাকে তার অর্জিত আয়ের খানিকটা অংশ ধ'রে দিত। কৌতূহল হ'ল। একজন দরিদ্র মুচির পক্ষে প্রতিদিন এইরূপ ভিক্ষাদান সত্যই বিস্ময়কর নয় কি? হয়তো সেই বৃদ্ধা তারই প্রতিপাল্যা। জুতো সারাবার অছিলায় মুচির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলাম।

কথায় কথায় জানলাম লোকটা অকৃতদার। অমরকণ্টক শহরের উপকণ্ঠে এক দরিদ্র পল্লীতে বাস করে। সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই। শৈশবে মা বাপ হারিয়েছে। এক দূর সম্পর্কিতা আত্মীয়া লালন পালন করেছিলেন—তিনিও গতাসু। স্বজাতির কন্যা পাওয়া দুষ্কর, তা' ছাড়া গৃহহীন, সহায় সম্বলহীন, আত্মীয়স্বজন-বিহীন মানুষের হাতে কে-ই বা কন্যা সম্প্রদান করে! অবস্থার বৈগুণ্যে তাই বিবাহ করা হয়ে উঠে নাই। লোকটির নাম কিষণদাস। কিষণদাস মহাদার্শনিক। তার দৈনিক খোরাক ও অন্য প্রয়োজন দশটি পয়সাতেই যথেষ্ট মিটে যায়। তার অধিক যা পায় তা সবই দান করে তার চাইতেও যে দীন দরিদ্র সেরূপ মানুষকে। কি হবে বাবুজী পয়সা হাতে রেখে—লোভ বাড়বে, ভোগেচ্ছা বাড়বে, মায়াবন্ধন বাড়বে—এই হচ্ছে কিষণদাসের জীবন-দর্শন। কিষণদাস পরম ভক্ত। মুখের সৌম্য শান্তি ও সহাস্য ভাবটি তার অন্তরের ঐশ্বর্যের স্পষ্ট পরিচয়। দিনান্তে কাজের শেষে নর্মদার জলে স্নান সেরে প্রথমে যাবে মন্দিরে। জাতে ছোট, তাই সসঙ্কোচে একান্তে দাঁড়িয়ে গলদশ্রু নেত্রে দেবতাকে অন্তরের আকুতি নিবেদন করবে।

তারপর কুটিরে ফিরে নিজ হাতে আহার প্রস্তুত করবে। আহারান্তে দড়ির খাটিয়ায় বসে একতারায় সুর যোজনা ক'রে ভজন গান। এই হচ্ছে কিষণদাসের নিত্য জীবনের নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচী। কতই বা বয়স হবে, বড় জোর চল্লিশ। এই বয়সেই একজন নিরক্ষর অন্ত্যজ, জৈব ভোগসুখের প্রলোভন ত্যাগ ক'রে মনকে ঈশ্বর-মুখী করে তুলতে পেরেছে দেখে আশ্চর্য লাগে। এ কেবল ভারতেই সম্ভব। ভারতের মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে আছে আধ্যাত্মিকতা। তাই বোধ হয় নিরক্ষর হয়েও কিষণদাস একজন পরম দার্শনিক।

কবে চলে এসেছি অমরকণ্টক ছেড়ে। সে স্বপ্নরাজ্যের অনেক স্মৃতিই আজ দীর্ঘকালের ব্যবধানে মলিন ও ম্রিয়মান। কিন্তু কিষণদাসের সেই সৌম্য, সহাস্য আনন্দঘন মূর্তি স্মৃতিপটে আজও অটুট উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিষণদাসের ভিতর ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। না, বৃথা হয় নি আমার এ তীর্থ-যাত্রা। নাই বা গেলাম ভিলাই, নাই দেখলাম রাউরকেলা। আমি—

ছেড়েই দিতে রাজি আছি সুসভ্যতার আলোক,
চাই না হতে নব বঙ্গে নবযুগের চালক।

শীতের পাহাড় সখের শহর

সখ ও সৌখীন মানুষের শহর মুশৌরী। হিল-স্টেশন হিসেবে খুব নামডাক। সৌখীন ভ্রমণকারীর জন্য লেখা সুদৃশ্য ছবিওয়ালা বইগুলিতে মুশৌরীকে বলা হয়েছে "দি কুইন অব ইণ্ডিয়ান হিল-স্টেশনস্।" এই সব বিজ্ঞাপনী সাহিত্য মানুষকে নানা লোভ দেখায়, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। আগে ভাবতুম হবেও বা

মুশৌরী কত সুন্দর! মনে মনে তুলনা করতুম আগের দেখা শিলং-দারজিলিং-উতকামন্দের সঙ্গে।

আবার দালাই লামার ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুশৌরীর মাহাত্ম্য আরও বেড়ে গেল। দেশে এত জায়গা থাকতে মহামান্য অতিথির থাকবার জায়গা নির্দিষ্ট হ'ল মুশৌরীতে—বিড়লা-ভবনে। মুশৌরীর পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়! অলক্ষ্যে মনের কোণে লোভ দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু এ-হচ্ছে পয়সার যুগ। ফেল কড়ি মাখ তেল। হও ব্যবসায়ী, হও কালবাজারী দু'হাতে পয়সা লোট, আর শখ মেটাও। তাই মন থেকে মুশৌরীর চিন্তা ঝেঁটিয়ে ফেলতে চাই। কী হবে ও-সব অসম্ভব কল্পনায়, আকাশ-কুসুম স্বপ্নে! মনকে প্রবোধ দেই—ও-সব সখের ভ্রমণে কাজ কি, ঘরে থাকাই ভাল। দেশের কাজ, সমাজের কাজ, শিক্ষা-বিস্তার আরও কত কী—বিলিয়ে দাও নিজেকে বিরামহীন কর্মস্রোতে। আজকের দিনের মানুষ লোভে মত্ত, ভোগেচ্ছায় ব্যাকুল। মানুষের মনের এই অধোগামী স্রোতের মুখ ফেরাতে চেষ্টা কর। এই ত আসল কাজ, সখের ভ্রমণের সময় কোথায়! আজকের মানুষের নিষ্ঠা, শ্রম আর ত্যাগের ভিত্তির উপরেই আগামী দিনের মানুষের সৎ ও সুন্দর জীবনের সৌধ রচিত হবে। ভবিষ্যতীয়েরা মনে রাখুক: "For your tomorrow, we gave our to-day". বেশ খানিকটা আত্মম্ভরিতার জাবর কাটা গেল। কিন্তু মন কি অত সহজেই প্রবোধ মানতে চায়! মুশৌরীর মোহন স্বপ্ন মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে মনের দুয়ারে উঁকি দিয়ে যায়।

এ-দিকে একটা সুবিধা হয়ে গেল। সরকারী মহলে আজকাল একটা জিনিসের খুব রেওয়াজ হয়েছে,—কন্‌ফারেন্স আর সেমিনার,

ওরিয়েণ্টেশন ও ট্রেনিং। শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, সমষ্টি-উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি সরকারী প্রায় বিভাগেই আজকাল কন্‌ফারেন্স ও সেমিনারের ছড়াছড়ি। দিল্লীর সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রক (Ministry of Community Development and Co-operation) আবার সকলের বাড়া। কন্‌ফারেন্স, সেমিনার, আলোচনা-বৈঠক, ইভ্যালুয়েশন আর অ্যাসেসমেণ্টের এত বাড়াবাড়ি আর কোথাও নেই। তবে নিমকহারামি করব না। কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের দৌলতেই ভারতের নানা প্রান্ত ও নানা স্থান দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এবারও এক সুযোগ এসে গেল। মুশৌরী পাহাড়ে ভারত সরকারের কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট মন্ত্রক এক প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছেন: Central Institute of Study and Research in Community Development. সারা দেশ থেকে ও নানা ক্ষেত্র থেকে এখানে শিক্ষার্থীরা আসেন কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের ইতিহাস, নীতি, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি আর ফলশ্রুতি বিষয়ে ওয়াকিফ-হাল হ'তে। এখানে আসেন, ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য, রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য, ভারতীয় প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারী, সরকারী নানা বিভাগের প্রধানগণ, খ্যাতনামা সমাজসেবক, পেশাদার রাজনীতিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পুরোপুরি একমাস ধ'রে এখানে সেমিনার বা আলোচনা চলে। কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে। এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার নাম সুপারিশ করা হ'ল। তাই বলছিলাম অপ্রত্যাশিতভাবে মুশৌরী যাত্রার সুযোগ এসে গেল। ভালই হ'ল, কলকাতার গরম এখন বাড়তির মুখে। মে আর জুন মাসের অসহ্য উত্তাপের হাত থেকে মাস খানেকের জন্য নিষ্কৃতি

—বড় সোজা কথা নয়! ধনীজন-বাঞ্ছিত শৈল-ভ্রমণ তাও সরকারী খরচায়!

বাইশে এপ্রিল পোটলা পুঁটুলি বেঁধে হাওড়া স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেসে আগে থেকেই বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। তাড়াহুড়ার কি আছে? ধীরে মন্থরে নির্দিষ্ট কামরার দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু কামরায় এসে দেখি ন স্থানং তিলধারণম্। কামরায় চারটি বার্থ—দুটি নিচে, আর দুটি উপরে। নিচের বার্থে জন বারো মানুষ আর উপরের বার্থ বিশ পঁচিশটা ছোট বড় মাঝারি বাক্স-প্যাটেরা, সুটকেশ, ব্যাগ, বেডিং, বাস্কেট, ঝুড়ি, লাঠি, বন্দুক, টুপি, টোপলা যত রাজ্যের জিনিসে ঠাসা। আমার ত চক্ষুস্থির! গাড়ির দরজায় রিজার্ভেশন স্লিপে আমার নাম ঠিক-ই আছে। অন্য নাম দু'টি পড়তেই ব্যাপারখানা পরিষ্কার বুঝা গেল। রাজা শঙ্কর প্রতাপ সিং দেও ও তৎপত্নী শ্রীমতী রত্নপ্রভা দেবী গাড়িতে আমার সহযাত্রী। শ্রীশঙ্কর প্রতাপ সিং দেও উড়িষ্যার ঢেঙ্কানাল রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজা, বর্তমানে উড়িষ্যা বিধানসভার গণতন্ত্র-পরিষদ দলের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য। শ্রীমতী রত্নপ্রভা দেবীও বিধান সভার সদস্যা। গাড়ির অন্যান্য ব্যক্তিরা এঁদের এগিয়ে দিতে এসেছেন, অথবা পরিচারক পরিচারিকা এঁদের সঙ্গেই যাবে। কি জানি রাজা রাজড়ার ব্যাপার, একটু বিনয়মিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গেই আমার বার্থের দখল চাইলাম। রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা উভয়েই অতি অমায়িক, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি। পরে এঁদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশে এঁদের সরল সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই বার্থ খালি ক'রে দেওয়া হ'ল। হোল্ড-অলটি খুলে বিছানাটি

পেতে ঠিক হয়ে বসলাম। আমার তৈজসপত্র অতি সামান্য, সেগুলি রাখবারও জায়গা পাওয়া গেল।

তারপর আলাপ পরিচয়ের পালা। প্রথমটা ইংরাজীতেই শুরু করা গেল। কিন্তু দু'চার কথার পরেই বাংলা-ওড়িয়া মিশ্রিত খিচুড়ি ভাষায় বাক্যালাপ চলতে লাগল। বছর পাঁচ-সাত আগে অনগুল যাওয়ার পথে ঢেঙ্কানালের বন দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম—আমার তরফ থেকে প্রথম আলাপের সেটাই সূত্র। রাজা সাহেব খানিক বাদেই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি পূর্ববঙ্গের মানুষ কিনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি করে বুঝলেন ?

বললেন, আপনার কথায় ভঙ্গিতে বুঝেছি আপনি ঢাকার মানুষ, কারণ আমার গৃহ-শিক্ষক, আর আমাদের স্টেটের দেওয়ান, বিচারপতি, এবং অন্য পদস্থ কর্মচারীরা অনেকেই ছিলেন রিটায়ার্ড বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারী এবং তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ঢাকার লোক।

রাজা সাহেব বেশ আমুদে আর মজার মানুষ। খুব হাসি-খুশি। পরেও দেখেছি ভদ্রলোকের মেজাজ খুব ভাল। সবার সঙ্গেই সরল ও সবিনয় ব্যবহার। খুব গল্পপ্রিয়। নিজেও নানা গল্প জানেন, আর গল্প শুনতেও ভালবাসেন। বয়সের কথা উঠলে, রাণীসাহেবার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন'ত এর বয়স কত। এ-পর্যন্ত মহিলার সঙ্গে আলাপই হয় নি। এতক্ষণে স্টেশন ছেড়ে বহুদূর এসে গেছে। মুস্কিলে পড়া গেল। রাণী সাহেবাকে নমস্কার করে বসে রইলাম, ভাবছি কি বলা যায়। রাজা সাহেব নাছোড়বান্দা। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।

কি করি! মহিলাদের বয়স অনুমান করা কঠিন, আর সেটা তাঁর সামনে বলা আরও কঠিন। রাজা সাহেবের বয়স সাতান্ন বৎসর। তাই আন্দাজে দশ বৎসর কমিয়ে বললাম, এই সাতচল্লিশ আটচল্লিশ হবে। প্রায় ঠিকই বলেছিলাম। রাণী সাহেবার বয়স একান্নবৎসর। প্রথম থেকেই রাজাসাহেব ও রাণীসাহেবার সঙ্গে হৃদ্যতা। মজার কথা, এঁরাও মুশৌরীর যাত্রী এবং যাত্রার উদ্দেশ্যও একই। বিধান সভার সদস্য হিসেবে এঁরাও যাচ্ছেন সেই সেণ্ট্রাল ইন্স্টিটিয়ুটে।

সারা পথটা এঁদের সাহচর্যে কাটল মন্দ না। বেশীর ভাগ কথা-বার্তাই রাজাসাহেবের শিকার ও অন্য নানা প্রকার সখের বিষয় নিয়ে। একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন। নানা সখ ও হুজুক আছে। অল্পবিস্তর জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছুই জানেন, বা জানেন ব'লে বলেন। গাড়ী ছাড়ার ঠিক আগেই রাজা সাহেব ও রাণীসাহেবার সঙ্গী তিনজন লোক ছাড়া আর সবাই নেমে গিয়েছিল। কামরাও পাতলা হল। এ তিন জন রাজা সাহেবের একান্ত সচিব, চাকর এবং রাণীসাহেবার খাস চাকরাণী। শ্রীহলধর মিশ্র রাজাসাহেবের একান্ত সচিব অন্যকথায় টাইপিষ্ট, সাধুয়া চাকর, আর লীলা চাকরাণী। সরকারী পরিভাষায় অনেকসময় বলা হয় - অফিসার চেনা যায় তার আর্দালিকে দিয়ে (An officer is known by his orderly)। রাজাসাহেবের পরিচারকেরাও হল খুব বশংবদ। সেণ্ট্রাল ইন্স্টিটিয়ুটে থাকা কালীন ধর বাবুর সাহায্য নিয়েছি অনেকবার। বড় বড় রিপোর্টের খসড়া অনেক রাত জেগে হাসিমুখে টাইপ ক'রে দিয়েছেন। এ-সব কাজ বলা বাহুল্য নিছক বেগার খাটুনি। গাড়িতে আমরা তিনজন আর রাণীসাহেবার

চাকরাণী লীলা। আমার সম্মতি নিয়েই লীলাকে গাড়ীর মেঝের এক কোণে একটা সতরঞ্চি বিছিয়ে বসিয়ে দিলেন।

রাজাসাহেবের লাটবহরের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, এবার বলি পোশাক আর খাওয়ার বহরের কথা। তু' রাত দেড়দিন গাড়িতে কাটালাম। রাজাসাহেব কিন্তু ফুলবাবু নন, অতিভোজী পেটুকও নন, আসলে তিনি হচ্ছেন রকমারি সখের মানুষ। সরল প্রকৃতির মানুষ, ছোট ছেলের মত মাঝে মাঝেই হরেক রকমের পোশাক বদলাচ্ছেন, আর করছেন খাই খাই। পরিচারিকা লীলা এ-বাক্স, সে বাক্স, এ-কৌটা সে-কৌটা খুলে খুলে তাঁর ফরমাস জোগাচ্ছে। তা ছাড়া প্রায় প্রতি স্টেশনেই রাজা সাহেবের কিছু না কিছু কেনা চাই। গল্প আর খাওয়া যুগপৎ চলেছে। আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন তাঁকে আমার কেমন লাগছে, তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা কি। এ-ক্ষেত্রে মুখের উপর শিষ্টাচারসম্মত জবাব দেওয়া ছাড়া আর কি করা যায়? একবার হয়ত জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর স্ত্রীকে (রাণীসাহেবা) কেমন লোক ব'লে মনে হচ্ছে।

শ্রীমতী রত্নপ্রভা দেবীকে যতটুকু দেখলাম, মনে হ'ল অতি ধর্মশীলা ও শান্তস্বভাবা মহিলা। সিনিয়র কেমব্রিজ অবধি পড়া। ইংরাজী ও বাংলা মোটামুটি বেশ জানেন। স্বল্পভাষিণী, সাদাসিধা ও সহৃদয়া। গাড়িতেও রীতিমত পূজা-আহ্নিক না করে জল গ্রহণ করলেন না। ইন্‌স্‌টিটিয়ুটে থাকার সময়েও প্রতিদিন নিয়মিত পূজা-আহ্নিক ও বিশেষ বিশেষ তিথিতে উপবাস ইত্যাদির ব্যতিক্রম করেন নি। ইনস্‌টিটিয়ুয়েটের কাজের শেষে রাজাসাহেব সদলে কেদার-বদরি উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন—বলা বাহুল্য, রাণী সাহেবারই আগ্রহে।

সারা পথ গরমে তেতে পুড়ে তিন দিনের দিন বেলা দশটা নাগাদ দেরাতুন এসে পৌঁছুলাম। পথে উল্লেখযোগ্য স্টেশন পড়ল মোগলসরাই, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার। কাশী বা বারাণসী আমার এই প্রথম দেখা। গঙ্গার পুলের উপর গাড়ী উঠতেই জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালাম। এ গঙ্গা কলকাতার গঙ্গা নয়। আরও শীর্ণকায়া। কবি সত্যেন দত্তের কাশীদর্শন কবিতার তুটো লাইন মনে আছে ঃ

এ-পাড়ে সবুজ বজরার খেত।

ও-পাড়ে পুণ্য পুরী।

গঙ্গার ধার দিয়ে এ-পাশে ও-পাশে, যতদূর চক্ষু যায় মন্দিরের ধ্বজা, দালানকোঠা, আর নদীর ঘাটগুলি ঠাসাঠাসি জড়াজড়ি হয়ে বহুদূর অবধি বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু অন্য পাড় সম্পূর্ণ ফাঁকা। খেতখামারের মাঠ এ-সময়টা রোদে খাঁ খাঁ করছে। সবুজের নামলেশ মাত্র নেই। বৃষ্টি নামলে চাষবাস শুরু হবে। এ-যাত্রা কাশী-দর্শন ভাগ্যে নেই। কাশী বিশ্বনাথের কৃপা না হ'লে এ-পুণ্যস্থান দর্শন হয় কি? মনে মনে দেবাদিদেব কাশীনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন ক'রে ভবিষ্যতে কাশী-দর্শনের সুযোগ প্রার্থনা করলাম।

কর্পূরগৌরং করুণাবতারম্
সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
ভবং ভবানী সহিতং নমামি।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

বেলা যতই বাড়ছে রোদের ঝাঁঝও ততই বাড়ছে। গাড়ির দরজা জানালা সব বন্ধ না ক'রে উপায় নেই, বাইরের গরম ঝলক

আর ধুলো দুই-ই প্রচণ্ড। ভিতরে অন্ধকার ও অসহ্য গুমোট। রাজাসাহেব তাঁর বিলেত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে যাচ্ছেন। আমি মনোযোগী শ্রোতার অভিনয় ক'রে যাচ্ছি। এ-কাজটা আমি বেশ ভাল পারি বলেই মনে হয়। অনেক সময় এমন এমন লোকের পাল্লায় পড়েছি, যে সেই কাতুকুতু বুড়োর মতো গল্প শুনিয়ে ছাড়বে, তখন অখণ্ড মনোযোগের ভান ক'রে তার ও আমার নিজের ধৈর্য পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত আমারই জয় হয়েছে। এ-ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। রাজাসাহেব বিলেত ভ্রমণ ছেড়ে শিকার, শিকার ছেড়ে রাজনীতি, আবার রাজনীতি থেকে ম্যাজিক এবং ম্যাজিকের পর তাঁর রন্ধন-কৌশল পর্যন্ত এসে হাল ছাড়লেন— একটা বড় হাই তুলে চোখ বুজে গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও হাপ ছেড়ে বাঁচলাম।

অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার পর পর ছায়া-মিছিলের মত মিলিয়ে গেল। যাওয়ার পথে নামা হ'ল না কোথাও। .দেরাদুন অবধি একটানা ট্রেন-ভ্রমণ পুরোপুরি চল্লিশ ঘণ্টার পথ। গরম ছাড়া অন্য কষ্ট বড় একটা হয়নি। দীর্ঘ ভ্রমণের সঙ্গী হিসেবে রাজাসাহেবকে বেশ ভালই লাগল। চলার পথে বই আমার নিত্যকালের সঙ্গী— এবার সঙ্গে ছিল সমারসেট মম আর বোরিস প্যাষ্টারনাক। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একঘেঁয়েমি এড়াবার জন্য রাজাসাহেবের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতুম। রাজাসাহেব একজন সত্যিকারের স্পোর্টস্‌ম্যান্‌, দিলখোলা মানুষ, ঠাট্টা-তামাসার কথা সহাস্যে শোনেন কিন্তু গায়ে মাখেন না।

মুশৌরী পাহাড়ের পাদদেশে ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ দেরাদুন উপত্যকা। পাহাড়ের উপর থেকে অরণ্যাকীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্য

দিয়ে প্রবাহিতা গঙ্গা ও যমুনার ধারা অস্পষ্ট চোখে পড়ে। স্থানীয় লোকেরা সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলে—গঙ্গাজী, যমুনাজী। দেরাতুন থেকে মুশৌরী একটানা বাইশ মাইল চড়াই। ট্যাক্সিতে যেতে দেড়ঘণ্টা সময় লাগে। পথে পড়ে কিষণপুর, রাজপুর এবং ভুট্টা ফল্‌স্‌। কিষণপুর অবধি রাস্তা প্রায় সমতল। রাস্তার দু'ধারে অজস্র আম ও লিচুগাছ। এ-দেশের আম ও লিচু স্বাদে গন্ধে বর্ণে অতি উপভোগ্য। ফলনও হয়েছে প্রচুর। কিষণপুর ও রাজপুরের দৃশ্য অতি মনোরম। উত্তরে হিমালয়। সর্পিল ভঙ্গীতে রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে। পথের দুধারে ছায়াতরুর স্নিগ্ধতায় ঘরবিবাগী মানুষ বেঁধেছে সাধনাশ্রম। কয়েকটি আশ্রমই এখানে রয়েছে দেখলাম। কিষণপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে একদিন কাটিয়ে গেলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য আশ্রমের তুলনায় কিষণপুর আশ্রমটি ক্ষুদ্র। দেরাতুন-মুশৌরী পথের ধারে আম ও লিচু বাগান ঘেরা ছোট্ট কিন্তু পরিছন্ন আশ্রমে মাত্র তিনজন সাধু বাস করেন। মিশনের এ-আশ্রমটি কর্ম-কেন্দ্র নয়, সাধন-ভজন কেন্দ্র। লোকালয় হ'তে দূরে নিভৃতে নির্জনে ধ্যান-ধারনা ও ভগবৎ-চিন্তার পক্ষে পরিবেশটি খুবই অনুকূল।

আমেরিকা হ'তে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরাখণ্ড ও হিমালয়াঞ্চলে সশিষ্য পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়েই স্বামীজী নির্জনতা ও নৈসর্গিক শোভায় মুগ্ধ হয়ে এ-অঞ্চলে আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজীর ইচ্ছানুসারেই তাঁর শিষ্যগণ পরে বার্লোগঞ্জ, কিষণপুর, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। কিষণপুর আশ্রমে ঠাকুরের নিত্য পূজা আর

হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ ভিন্ন অন্য কোন কর্মপন্থা অনুসৃত হয় না। নির্জন ভগবৎ-সাধনাই সন্ন্যাসীদের প্রধান উপজীব্য। আশ্রমের উত্তর পাশ দিয়ে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী প্রবাহিত। তারপর অদূরে হিমালয়ের অপেক্ষাকৃত নাতি-উচ্চ শাখা প্রশাখা। আশ্রমপ্রাঙ্গণের বাইরে অনতিদূরে একটি পাহাড়ী বস্তী। বস্তী-বাসীরা সকলেই আশ্রমের অনুরাগী ভক্ত এবং আশ্রমের দাতব্য হোমিওপ্যাথি ডিস্‌পেনসারির মক্কেল। মুশৌরীর হোটেলে একাদিক্রমে দালদায় রান্না না-ইংলিশ না-ভারতীয় নানা-মিশেলী খাদ্য খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গিয়েছিল। কিষণপুর আশ্রমে প্রসাদ পেলাম—কচি আমের ডাল আর আলুপটলের তরকারী সহযোগে ভাত। খুবই ভাল লেগেছিল। বাঙালীর ভাতের নাড়ী ডাল ভাতের গন্ধে-স্বাদে সজাগ হয়ে উঠল।

মুশৌরীতে ছিলাম পুরোপুরি একমাস। বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল রামপুরের নবাব বাহাদুরের প্রমোদ ভবন "চমন এস্টেটে।" অনেকটা জায়গা জুড়ে নবাব বাহাদুরের প্রমোদ ভবন। দেরাদুন থেকে ট্যাক্সি বা বাস এসে থামে লাইব্রেরী-পয়েণ্টে। সেখান থেকে সোজা প্রায় তিনপোয়া মাইল খাড়াই ভেঙ্গে উঠতে হয় "চমন এস্টেটে।" শহরের এক প্রান্তে "চমন এস্টেট।" লাইব্রেরী-পয়েণ্ট অবধি নেমে না গেলে হাট বাজার, দোকান, ডাকঘর, হোটেল, সেলুন কিচ্ছু পাবার জো নেই। নামার সময় না হয় তরতর নেমে গেলুম, কিন্তু ফিরবার সময় বোঝ ঠ্যালা। তিনপোয়া মাইল উঠতে দম বেরিয়ে যেত। আমাদের দলের অনেকে উঠবার ভয়ে আর লাইব্রেরী-পয়েণ্ট মুখো হ'তে চাইত না। কিন্তু পাহাড়ী জায়গায় রীতিমত চলাফেরা না করলে দেহ সুস্থ

থাকতে অস্বীকার করে। তাই রোজ বৈকালে নিয়মমত কমপক্ষে ৩।৪ মাইল হাঁটাহাঁটি করতুম।

"চমন এস্টেটে" অনেকগুলি ছোট বড় বাংলো। তার কোনটায় ডাইনিং হল, কোনটায় সেণ্ট্রাল ইন্‌স্‌টিটিয়ুটের দপ্তর ও লেকচার-রুম, আর বাকীগুলি ইন্‌স্‌টিটিয়ুটের কর্মচারীদের বাসা বাড়ি এবং সেমিনারে যোগদানকারীদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট। লাইব্রেরী-পয়েণ্ট থেকে কুলির মাথায় বাক্‌স বিছানা চাপিয়ে চমন এস্টেটের রিসেপ্‌শন-রুমে গিয়ে হাজির হ'লাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রিসেপ্‌শানিষ্ট অফিসার একটা কাঠের ট্রে এগিয়ে ধরলেন। ট্রেতে আছে কতকগুলি গুলীপাকানো ছোট ছোট কাগজ। তাই একটা তুলে নিলুম আর ভাঁজ খুলে দেখলাম লেখা আছে রুম নম্বর ১৮এ। অর্থাৎ লটারিতে ১৮এ নম্বর রুম আমার ভাগ্যে জুটেছে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। সংলগ্ন বাথরুম সহ এক-শয্যা-বিশিষ্ট একটি কামরা পেয়ে গেলুম। অনেকের ভাগ্যেই সিঙ্গল-সিটেড রুম ও সংলগ্নবাথরুম জোটেনি। আমার রুমের দু'পাশে আরও দু'টি কামরা—এক কামরায় আসামের শ্রীগোলকেশ্বর বড়ুয়া এবং আলতাফ আহমেদ, আর অপরটিতে মধ্য প্রদেশের শ্রীরামস্বরূপ চৌবে থাকতেন। অসমীয়া ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় ক্রমশঃ হৃদ্যতায় পরিণত হ'ল। তার আসল কারণ তাঁদের সঙ্গে অসমীয়ায় কথোপকথন। কবে কোন ছেলেবেলায় আসাম ছেড়ে আসার পর থেকে অসমীয়ায় কথাবার্তা বলার অভ্যাস প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এবার দেখলাম যে সামান্য ৩।৪ দিনের চেষ্টাতেই পূর্বের অভ্যাস অনেকটা ফিরে এল। তারপর সারা মাস ওঁদের সঙ্গে অসমীয়াতেই কথাবার্তা চালিয়েছি। সেমিনারে এসে আমার

নিজের একটা বড় রকমের উপকার হ'ল। আসামীদের সঙ্গে অসমীয়ায়, ওড়িয়াদের সঙ্গে ওড়িয়ায়, আর হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে হিন্দীতে বাতচিৎ করবার সুযোগটা নষ্ট হ'তে দিই নি। ভুলত্রুটি অগ্রাহ্য ক'রে কথাবার্তা চালিয়েছি। মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। কেউ অখুশি হয়নি তাতেও সন্দেহ ছিল না।

বাঁধিলাম বাসা
মনে হ'ল আশা,
আরামে দিবস যাবে।

দিনগুলি মোটামুটি মন্দ কাটেনি। আমরা এসেছিলাম মোট চল্লিশজন। গোটা ভারতবর্ষই প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। আসাম, মনিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও দিল্লী—সব মুলুক থেকেই মুখপাত্রগণ সশরীরে বিদ্যমান। কি বিচিত্র এই দেশ—এই মহান সত্য উপলব্ধি করবার এমন সুযোগ সচরাচর হয় না। রেলভ্রমণে, এরোড্রোমে, কুম্ভমেলায়, বা তীর্থে নানা ভাষী, নানা বেশী ভারতবাসীর সাক্ষাৎ লাভ হয় বটে, কিন্তু এতটা নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে হয় না। এখানে ব্রেক্‌ফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার, বক্তৃতা-আলোচনা, সান্ধ্য-ভ্রমণ মজলিস সব কিছুতেই যেন মিনিয়েচার (miniature) বা ক্ষুদে ভারতবর্ষ। নানা মত, নানা মর্জি, নানা ভাব, নানা ভাষা সব কিছুর বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও একটা অস্পষ্ট কিন্তু অনস্বীকার্য ঐক্য অনুভব করা যায়।

ইন্‌স্‌টিটিয়ুট তথা "চমন-ভবনে" পরিবার অর্থাৎ স্ত্রী নিয়ে থাকা নিষিদ্ধ। কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই আগন্তুকগণকে এ-বিষয়ে

হুশিয়ার করে দেন। বলে দেওয়া হয় কেউ যেন পরিবার সঙ্গে না আনেন। ঢেঙ্কানালের রাজা ও রাণী সাহেবা অবশ্য এই কঠিন নিয়মটিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন এই অজুহাতে যে তাঁরা দু'জনেই পৃথকভাবে রাজ্যসভার সদস্যরূপে মনোনীত হয়ে এসেছেন।

ইন্‌স্‌টিটিয়ুটের অধ্যক্ষ শ্রী এস্ চক্রবর্তী আই, সি, এস ভদ্র, সজ্জন ও অমায়িক ব্যক্তি। তাঁর অসীম ধৈর্যশীলতার বহু পরিচয় পেয়েছি। আমরা চল্লিশজন, আলোচনা সভায় যখন যুগপৎ সবাই মুখর হয়ে উঠতাম, যখন একই বক্তব্য বারবার একজন বক্তাই পেশ করতেন, তখন লক্ষ্য করেছি যে, চক্রবর্তী মহোদয় বেশ উপভোগ্য হাস্য-রসিকতার সঙ্গে সমস্ত পরিস্থিতির একটা সমাধান খুঁজে বের করতেন। প্রায়ই বক্তারা মূল বিষয়টিকে বাদ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর কথা বলে যেতেন। চক্রবর্তী মহাশয়কে কিন্তু কখনো বিন্দুমাত্র বিরক্ত বা বিচলিত হ'তে দেখিনি। বরঞ্চ যুক্তিহীন অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার ভিতর থেকেও সুকৌশলী ডুবারির মত বিবেচনাযোগ্য কথা আহরণ করে আনতেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করার যোগ্যতা এঁর অসাধারণ। শ্রী এস, চক্রবর্তী, নাম পদবী শুনে বাঙ্গালী বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয় মাদ্রাজী। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ না করলে শ্রীচক্রবর্তীর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভদ্র মহিলা আলাপী, মিশুক ও সপ্রতিভ। প্রায়ই ইন্‌স্‌টিটিয়ুটে আসেন আমন্ত্রিত বক্তাদের ভাষণ শুনতে। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ মুশৌরীর ম্যালে। আমার সঙ্গে ছিল ইন্‌স্‌টিটিয়ুটের কর্মী শ্রীকুলদীপ। তিনিই আলাপ করিয়ে দিলেন।

শ্রীমতী চক্রবর্তী বাংলাদেশে স্বামীর সঙ্গে একাধিক বার এসেছেন।

বেলুড় মঠে সমাজ-শিক্ষা শিক্ষণ বিদ্যালয়ে দিনকয় অতিথি রূপে কাটিয়ে গেছেন। তাঁর ভাল লেগেছে বেলুড় মঠের পরিবেশ ও মিশনের কর্ম পদ্ধতি। স্বামীজিদের অনেকের কথাই স্মরণ করলেন। ৮ই মে "চমন ভবনে" আমরা জন তিনচার বাঙ্গালী উদ্যোগ ক'রে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম। স্থানীয় ওয়েভার্লি কন্‌ভেণ্টের আর্ট-শিক্ষক শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় হলেন প্রধান উদ্যোক্তা। কথা ছিল অধ্যক্ষ চক্রবর্তী সভায় পৌরোহিত্য করবেন। কিন্তু সভার কাজ শুরু হবার প্রাক্কালে শ্রীমতী চক্রবর্তী এসে জানালেন যে তাঁর স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—আসতে পারবেন না। সভায় আমন্ত্রিত বহু লোকজন এসে পড়েছেন। গায়ক-গায়িকা ও বক্তারাও উপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতী চক্রবর্তীকেই সভার কাজ পরিচালনা করবার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

ভদ্র মহিলা আমাদের সঙ্কট বুঝে এক কথায় রাজী হলেন, এবং একান্ত অপ্রস্তুত অবস্থাতেও যে ভাবে সভার কাজ পরিচালনা করলেন এবং সভানেত্রীর ভাষণে যে কয়টি কথা বললেন তার জন্য তাঁকে অসংখ্য সাধুবাদ করতে হয়। ইন্‌স্‌টিটিয়ুটের নানা বিষয়ক যে সব রিপোর্ট বের হয় শ্রীমতী চক্রবর্তী প্রায় সবগুলিই সাগ্রহে পড়ে থাকেন। একথা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছি। এই রিপোর্টগুলি নেহাৎই নীরস। তাই ভেবে আশ্চর্য হই যে ভদ্রমহিলা এই নীরস রিপোর্টগুলি কি সুখেই না পড়েন। শ্রীচক্রবর্তী একজন প্রবীণ আই, সি, এস অফিসার। তাঁদের দুই ছেলে।

বড়টিকে দেখেছি—বয়স ২১। ২২ হবে। এ থেকে শ্রীমতী চক্রবর্তীর বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য এত সুন্দর যে বয়স মনে হয় চব্বিশ পঁচিশ।

যে চল্লিশ জন ব্যক্তি ভারতের নানা অঞ্চল থেকে ইন্‌স্‌টিটিয়ুটে এসে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা চালে চলনে, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিতে বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রতিভূ। এই প্রতিনিধি-সমাবেশের একদিকে ছিলেন ধর্মপ্রাণ, দার্শনিক প্রবীণ দলীপসিং। রাজস্থান বিধান সভার সদস্য দলীপসিংজীর বয়স সত্তরের কোঠায়। সৌম্য ও আনন্দময় পুরুষ। ব্যবহারে ও কথাবার্তায় শান্ত ও সংযত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, পরমহংস রামকৃষ্ণ ও যোগীশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও জীবনী বিষয়ে বেশ পড়াশুনা করেছেন। অবস্থাবৈগুণ্যে যদিও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর আর অধিক দূর অগ্রসর হ'তে পারেন নি, তবু নিজের চেষ্টায় ও স্বেচ্ছানুশীলনের দ্বারা নিজেকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করে তুলতে কসুর করেন নি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে সুখী। দলীপসিংজী-এর ঠিক বিপরীত হচ্ছে কয়েকজন সদ্য-নিযুক্ত আই, এ, এস (I. A. S.) অফিসার পোশাকে-আশাকে আর বোল-চালে নিজেদের চাকরীর মহিমা প্রচারে সদা সচেষ্ট। নামের পিছনে ঐ আই, এ, এস, লেজুড়টা না দিলেই নয়। যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ঐ অক্ষর তিনটি জাহির করা চাই। চার পাঁচ জনের একটি গ্রুপ অন্য সকলকে সযত্নে এড়িয়ে চলবে যেন এঁরা হচ্ছেন কুলীন। স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজের প্রশাসনে যে সেই সাবেকী ইংরাজ-আমলের হাকিমির স্থান নাই এ-কথাটা আজ ভুললে চলবে না। আজ আপামর-জনসাধারণের পঙ্‌ক্তি-ভুক্ত হয়ে ও সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জনসেবায়

আত্মনিয়োগ না করতে পারলে প্রশাসন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। যে কয়জন আই, এ, এস্ জেলা সমাহর্তা এ-দলে ছিলেন তাঁরা সবাই গ্রাম-সেবক গ্রাম-সেবিকা, মুখ্যসেবিকা, ও ব্লক ডেভেলপ্‌মেণ্ট্ অফিসারের যোগ্যতা ও গুণাবলীর বিশ্লেষণে সেবামূলক মনোভাবের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। কিন্তু নিজেদের বেলায় সেই কথাটাই বেমালুম উহ্য রেখে গেলেন।

এঁরা চান সব ক্ষমতা এঁদের হাতে তুলে দেওয়া হোক, এবং জেলার যাবতীয় সরকারী কর্মচারী, সে যে-কোন বিভাগেরই হোক না কেন, এঁদের কর্তৃত্বের আওতায় আসুক। এঁরা হ'তে চান জনগণের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তা। বৃটিশ-আমলের সর্বশক্তিমান আই, সি, এস হাকিমদের দোসর হওয়াই আমাদের এই নূতন আই, এ, এস অফিসারদের কাম্য বলে মনে হয়। ট্রেনিং-এর ভিতর দিয়ে সেই পুরাতন-হাকিমি মেজাজ ও মনোভাবকে সংযত করে আনা একান্ত প্রয়োজন। নইলে জাতীয় সংগঠন ও সমষ্টি-উন্নয়ন কর্মসূচিতে এরা প্রকৃত নেতৃত্ব কখনই করতে পারবেন না। কেবল নিচু তলার গ্রাম-সেবককে হ'তে হবে জনসেবক, আর তার উপরিওয়ালারা হবেন প্রভু—এর চাইতে অদ্ভুত এবং অসঙ্গত ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে!

দলের অনেকে এসেছে নিছক ফুর্তির খোঁজে। সেমিনারের অধিবেশন ও আলোচনা সভায় এরা অনেকটা নিরাসক্ত দর্শক বা শ্রোতা। এদের মন পড়ে থাকত কুলুরি বাজারে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এঁরা নিয়মিত হাজিরা দিতেন হ্যামার্সের মদের দোকানে, নয় কোন পাঞ্জাবী বার-রেঁস্তোরায়। মুশৌরীতে মদের দোকানের ছড়াছড়ি। আগেকার আমলে

দিল্লীর বড়লাট আর বড় বড় সাহেব সুবোরা যেতেন সিমলা, আর দেরাছুনের মিলিটারী আফিসারেরা সদলে ও সপরিবারে আসতেন মুশৌরী। মুশৌরীতে কাপুরথালা, রামপুর এবং আরও অনেক পাঞ্জাবী রাজা-জমিদারদের শৈলাবাস আছে। মরশুমের সময় মুশৌরী শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত ফুর্তিকামী মেয়েপুরুষের সমাগমে। সে আমলের সাহেব-মেমের জৌলুস আর না থাকলেও আমাদের পাঞ্জাবী ভায়ারা সে শূন্যস্থান অনেকটা পূর্ণ করে রেখেছে। পাঞ্জাবী মেয়েরা মেম সাহেবদের হুবহু অনুকরণ।

এদের পরণে স্ন্যাক্ বা টাইট জিন, মুখে সিগারেট—দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুশৌরীর ম্যালে। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার চরম ক'রে ছাড়ছে। আর বহু মধুলুব্ধ পতঙ্গ এদের ঘিরে গুঞ্জন তুলেছে মুশৌরীর পথে পথে। আমাদের দলেরও কেউ কেউ যে এই মধুচক্রে যোগ দিয়ে মুশৌরী প্রবাস সার্থক ক'রে তুলতে প্রয়াস করেন নি তা নয়।

আশা করেছিলাম যে দেশের এই বাছা বাছা মানুষগুলির সান্নিধ্যে ভাববার ও জানবার অনেক সামগ্রী পাওয়া যাবে, কিন্তু সে আশা সবটা পূর্ণ হয় নি।

*　　*　　*

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি ইন্‌স্‌টিটিয়ুটের কাজ। মাঝে দেড়ঘণ্টা মাধ্যাহ্নিক লাঞ্চের জন্য বিরাম। কিন্তু বক্তৃতা আর আলোচনার বিরাম নেই। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে চলছে রিপোর্ট লেখা। বাইরে থেকে নামজাদা বক্তা যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ আর কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্টের মন্ত্রী স্বয়ং শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দে। তা ছাড়া ফোর্ড

ফাউণ্ডেসনএ'র ডক্টর লীগ্যানস্, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর বতমোর, প্ল্যানিং কমিশনের শ্রীআঞ্জারিয়া প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরাও আমাদের আলোচনায় নানা বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন। সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয়টি ছিলঃ পঞ্চায়েতীরাজ অথবা গণতন্ত্রের বিকেন্দ্রীকরণ। পঞ্চায়েতীরাজ এ পর্যন্ত পুরোপুরি প্রবর্তিত হয়েছে ভারতের দু'টি রাজ্য অন্ধ্র ও রাজস্থানে। উভয় রাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন আমাদের এই দলে। জেলা পরিষদের প্রমুখ এসেছিলেন দু'জন। এঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বুঝা গেল যে, এঁরাও পঞ্চায়েতের মারফৎ সব ক্ষমতা হস্তগত করতে চান। এঁদের স্পষ্ট অভিপ্রায় জেলাশাসকের সবখানি ক্ষমতা ও মর্যাদা কেড়ে নিয়ে জেলা-প্রমুখের হাতে অর্পণ করা। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিকেন্দ্রীত গণতন্ত্রের কি হাল হয় সেটা গভীর আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করবার বিষয়।

* * *

আমাদের বাসা "চমন ভবন" থেকে রাস্তাটা গড়িয়ে লাইব্রেরী-পয়েণ্ট অবধি এসে অনেকটা সমতলে পড়েছে এবং তারপর এগিয়ে গিয়েছে কুলুরি বাজার হ'য়ে ল্যাণ্ডৌরের দিকে। গোটা পথটা সাড়ে চার মাইল লম্বা হবে। এটাই মুশৌরীর মুখ্য পথ বা ম্যাল। ম্যালে দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়ালে দূরে বনান্তরালে আবছা আবছা দেরাদুন শহর দেখা যায়। লাইব্রেরী থেকে আর একটা রাস্তা মূল মুশৌরী শহরকে পিছনে ফেলে চলে গিয়েছে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন—পাশে রেখে বিড়লা ভবন অবধি। বিড়লা ভবনেই থাকতেন মহামান্য দালাইলামা। আমার আসার দিনকয় পরেই দালাই লামা সদলে মুশৌরী ছেড়ে অধিকতর নিরাপদ শৈল-শহর-ধরমশালায় চলে গেলেন।
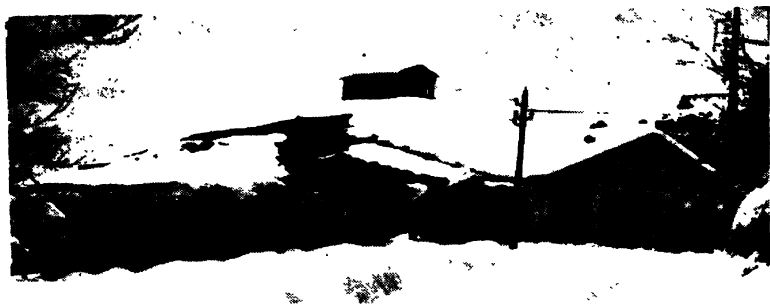
বরফে ঢাকা মশৌরী শহর
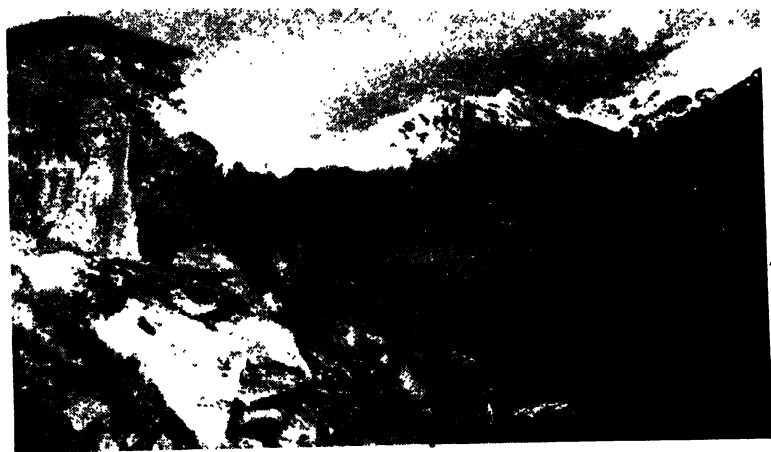
মুশৌরীর পথ

তরঙ্গোজ্জ্বল সমুদ্রসৈকত, কলম্বো

মুশৌরীর সব চাইতে বড় বিজ্ঞাপন এর মনোরম সূর্যকরোজ্জ্বল দিনগুলি। এপ্রিল, মে, ও জুন বছরের শ্রেষ্ঠ সময়। সহনীয় আরামপ্রদ শীত আর রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল-দুপুর মনে করিয়ে দেয় দারজিলিং-এর মেঘবৃষ্টি এবং অনিশ্চিত আবহাওয়ার কথা। আকাশ নীল নির্মেঘ। দূরে দিগন্ত-সীমায় হিমালয়ের সাদা চূড়াগুলি দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে বদ্রীনারায়ণের চূড়াগুলিও চোখে পড়ে। গঙ্গোত্তরী যমুনোত্তরীর ক্ষীণ দূরাভাস পাওয়া যায়। মুশৌরীর আশেপাশে কয়েকটা জলপ্রপাত আছে: কেম্প্‌টি প্রপাত ও ভুট্টা প্রপাত। এ সময়ে জল আছে অতি সামান্যই, দেখবার বিশেষ কিছু নেই। যাতায়াতের মেহনত-ই সার। শহরের অনতিদূরে আর একটা দেখবার জায়গা "ক্যামেলস্ ব্যাক্ হিল" উটের পিঠের মত একটা বিদ্‌ঘুটে পাহাড়। অনেকে দেখতে যায়। মোটকথা, মুশৌরীতে দেখবার দৃশ্য আর বেড়াবার জায়গা খুব বেশী নেই। সে দিক দিয়ে দারজিলিংএর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না মুশৌরী। শিলিগুড়ি থেকে দারজিলিং যেতে ছাপ্পান্ন মাইল পথের ধারে ধারে যে পদে পদে পরিবর্তনশীল দৃশ্য দেখা যায় তার তুলনা কোথায়? টাইগার হিল্‌সে সূর্যোদয়, তুষার শুভ্র কাঞ্চন জঙ্ঘার শিখরমালা, দারজিলিংএর বোটানিক গার্ডেন আর বহুরূপী পাহাড়ী মানুষগুলির তুলনায় বহুল-বিঘোষিত "কুইন অব দি হিলস্টেশনস্" মুশৌরী শহরটার একঘেয়ে ও আটপৌরে চেহারাটা মনের উপর আদৌ কোন রেখাপাত করে না। তবে হ্যাঁ, এ-শহরের সৌন্দর্য দেখতে হ'লে আসতে হয় শীতের সময়। সে সময় সারা অঞ্চলটাই বরফে ঢেকে যায়। পথঘাট, পাহাড় বন, বাড়িঘর সব কিছু তখন বৈধব্যের শুভ্রবেশে

এক শুচিস্মিত রূপ ধারণ করে। তারই একটু আভাস পেলাম একদিন।

বিকাল ৩টা। সেদিন ছিল ছুটি। তাই ঘরে বসে একটু পড়াশুনা করছিলাম। রুদ্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে দূর পাহাড়ের গায়ে প্রলম্বিত পাইন বনের ছায়ায় ইতস্ততঃ ছড়ান ছোট ছোট বাংলো-গুলি বেশ দেখাচ্ছিল। জানালা দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটা গোটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দুপুরের ক্লান্ত আবেশে মুশৌরী পাহাড় যেন স্তিমিত তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যান্তর ঘটল। আকাশে গুম গুম আওয়াজ। পাইন বনের মাথায় মাথায় শুরু হ'ল ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ ছেয়ে গেল মসীকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জে। প্রবল বৃষ্টি ও ঝড় আরম্ভ হয়ে গেল। একবার মাত্র জানালাটা খুলে বাইরের ব্যাপারখানা ভাল করে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটে জানালাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টি চলল প্রায় দু'ঘণ্টা অবিরাম ভাবে। ঘরের বিজলী বাতি বিগড়ে গেল! অন্ধকারেই বসে রইলাম। কিন্তু বসে থাকবার জো নেই। দেখতে দেখতে তাপ নেমে গেল অনেকখানি। হাড়ে হাড়ে শীত অনুভব করতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি উঠে গায়ে গরম জামা ও চাদর চাপালাম। এ-দিকে আর এক বিপদ—উপরের ছাদ দিয়ে এতক্ষণে জল পড়তে শুরু করেছে। পুরানো ঢেউ-তোলা টিনের বাংলো। বহুদিন ভালো রকম মেরামত হয়নি। প্রবল বর্ষণের বেগ রুখতে পারবে কেন? আর মনে হচ্ছে টিনের ছাদের উপর যেন অবিশ্রান্ত ঝনন-ঝেনন করতাল বাজছে, অর্থাৎ শিলা পড়ছে প্রচণ্ড ধারায়। আবার উঠতে হ'ল। বিছানাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে টেনে নিয়ে

এলাম। ঘরের প্রায় সব জাগাতেই জল। মেঝের কার্পেটখানা জলে ভিজে গেছে। ঘরের ভিতর অন্ধকার, জানালা দিয়ে বাইরের কিছুই দেখা যায় না। চারিদিক বৃষ্টিতে ঝাপসা দেখাচ্ছে। আকাশ চিরে ঘন ঘন বিদ্যুত চমকাচ্ছে আর দেয়া ডাকছে গুরু গুরু গুরু গুরু। ঘণ্টা দুই বাদে বৃষ্টি থামল। হাওয়ার মাতামাতি স্তব্ধ হয়ে গেল। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাড়ালুম। তাকিয়ে দেখি ডাইনে বাঁয়ে, সমুখে পিছনে সব একেবারে সাদা। গাছপালা, ঘর বাড়ি, রাস্তা ঘাট, বন পাহাড় সব বিলকুল সাদা। সব বরফে ঢেকে গেছে। "চমন ভবনের" বাগানে কেমন সুন্দর গোলাপ, ডালিয়া, ক্রিসেন্থামাম আর ম্যাগনোলিয়া ফুল ফুটেছিল। সব ঝরে পড়েছে। সব সাদা হয়ে গেছে। সারা মুশৌরী পাহাড় আজ সাদা বরফের চাদরে আপাদ-মস্তক ঢেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুশৌরীর সাধারণ দৃশ্য বড়ই একঘেয়ে লাগছিল, আজ এই বরফ-ঢাকা পাহাড়টার দিকে চেয়ে মনে হ'ল অন্তত একদিনের জন্য হ'লেও মুশৌরী আসা সার্থক হয়েছে।

* * *

রোজ ম্যালে বেড়াতে যাই। 'চমন ভবন' থেকে হাঁটতে হাঁটতে কোন কোন দিন কুলুরি বাজার ছাড়িয়ে ল্যাণ্ডোর অবধি চলে যাই। যাতায়াতে প্রায় দশ মাইল। জলবায়ুর গুণে আদৌ ক্লান্তি-বোধ হয় না। প্রায়ই বেড়াই একা একা। কোন কোন দিন শিল্পী চিত্তরঞ্জন রায় সঙ্গ নেন। গল্প-গুজবে পথ চলি। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ। পথে বাঙ্গালীর মুখ খুঁজে বেড়াই। হয়ত দু-চার জনের একটা ছোট দল পাশ দিয়ে গেল। কান পেতে কোন ভাষায় কথা বলে তা ধরবার চেষ্টা করি। দিন কয়েকের

মধ্যেই বেশ কয়েকজন বাঙ্গালীর সন্ধান পেলাম। পরে অভিবাদন বিনিময়ে কিঞ্চিৎ পরিচয়ও হ'ল। বেশীর ভাগই চেঞ্জে এসেছেন। কেউ বা এখানকার প্রায়-স্থায়ী বাসিন্দা অর্থাৎ চাকরী উপলক্ষ্যে মুশৌরী-প্রবাসী।

একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে আমন্ত্রণ পেলাম ল্যাণ্ডৌরে গণেশ হোটেলে এক সাহিত্যসভায়। স্থানীয় বাঙ্গালীদের উদ্যোগে সভা আহূত হয়েছে। গেলাম। সভায় আলাপ পরিচয় হ'ল অনেকের সঙ্গে। তার মধ্যে নাম করতে হয় "মরুতীর্থ হিংলাজ" রচয়িতা অবধূতের। তিনিও এসেছেন চেঞ্জে। বেশ আলাপী লোক। টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়। বারবার বলতে লাগলেন যে বাসাটা তার বেজায় ছোট, জায়গা হয় না একেবারে। কাণাঘুষায় শুনেছিলাম অবধূত মশায়ের সঙ্গিনী ভৈরবীর কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, বাসায় আপনার লোক ক'জন? বল্লেন: তিনি নিজে, ভৈরবী, এক পরিচারিকা আর আটটি ছেলেমেয়ে ও তাদের মা। তার ঘর মাত্র দু'খানা। সত্যি তো, স্থানাভাব হওয়া স্বাভাবিক। বাসায় এসেই ভৈরবীকে ডাকলেন। এক মধ্যবয়সী মহিলা বেরিয়ে এলেন। কোলে একটা কুচকুচে কালো বেড়ালছানা। একটা ছোট্ট ফীডিং বোতল দিয়ে তাকে দুধ খাওয়ান হচ্ছে। খানিক বাদেই একটা কালো বেড়াল আর সাতটা কালো কালো বাচ্চা বেরিয়ে এসে ভৈরবীর পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করতে লাগল। এরাই হ'ল অবধূতমশায়ের ছেলেমেয়ে। এরা সবাই অবধূতের সঙ্গে এরোপ্লেনে দিল্লী হয়ে মুশৌরী পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসেছে। যেমন অদ্ভুত শখ, তেম্নি পয়সার প্রাচুর্য। বুঝলাম অবধূতমশায় ধূমকেতুর মত বাংলার সাহিত্যাকাশে

অকস্মাৎ উদিত হয়েই একেবারে বাজীমাৎ ক'রে ফেলেছেন। অবধূতের লেখা বইগুলির কাহিনী চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। এঁর জীবনের অভিজ্ঞতাও বিচিত্র। এঁর বইগুলি বাজারে কাটে বিস্তর। মোটা মোটা রয়্যালটি পান নিশ্চয়ই নইলে শখ ক'রে বিড়াল ছানা নিয়ে মুশৌরী শহরে বেড়াতে আসবেন কিসের জোরে।

যাক্ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে আনন্দ পেলাম। ঘণ্টা তুই ছিলাম। নানা মুলুকের নানা কাহিনী অনর্গল ব'লে যেতে পারেন। শুনতেও ভাল লাগে। চুঁচুঁড়া শহরে গঙ্গার ধারে এঁর স্থায়ী আশ্রম। কলকাতা ফিরে গিয়ে তাঁর চুঁচুঁড়া আশ্রমে একবার যাবার জন্য আমায় অনুরোধ জানালেন। বিদায় নিলাম। কালই আমার মুশৌরী ছেড়ে যাবার নির্দিষ্ট দিন। রাত্রেই গোছগাছ শেষ করতে হবে। কাল সকালে সময় পাওয়া যাবে না। বেলা ১২টা অবধি ইনস্টিটিয়ুটের কাজ শেষ ক'রে বেলা ১টা নাগাদ দেরাতুনের বাস ধরতে হবে।

মুশৌরী প্রবাসের আজই শেষ সন্ধ্যা।

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই—

১। অন্য দেশ
২। আপন দেশ
৩। সমাজশিক্ষার ভূমিকা
৪। জনশিক্ষার কথা
৫। শিক্ষা-বিচিত্রা
৬। Never Too Late
৭। Inspection of Schools and Other Essays.